মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

৪ ❖ পৃষ্ঠা

sompriti.pabna@gmail.com

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

sompriti.pabna

সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রতি মাসের ১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৪ ● ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ ● ঢাকা শনিবার ● ১৪ মার্চ ২০২৬ ● ২৪ রমজান ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

মশার হুঙ্কার

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দিন নেই রাত নেই- সবখানে সবসময় মশার উৎপাত শুরু হয়েছে। এরা কয়েল, ধুপের ধোঁয়া ইত্যাদি কোন কিছুকেই মানছে না। এমনকি পৌরসভার যৎসামান্য ওষুধকেও এরা থোড়াই কেয়ার করছে। এদের আগ্রাসনে মানুষের এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আগে দিনের বেলায় অন্তত এই মশারা অনেকটা আড়ালে থাকতো, অর্থাৎ সন্ধ্যে বা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সকল পাঠক, লেখক, সাংবাদিক-কর্মচারী, বিজ্ঞাপনদাতাসহ শুভাকাঙ্ক্ষিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সবার জন্য সম্প্রীতির বন্ধন হোক সুদৃঢ়। আগামীর দিনগুলো হোক মঙ্গল ও শান্তিময়। –সম্পাদক

নাব্যতা হারিয়ে ১৫ রুট অচল : ৪শ কিলোমিটারের ৩শ-ই নেই

ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে নৌপথ

■ মোসতাফা সতেজ

পাবনায় যত নদী-উপনদী আর বিল আছে তা মিলে পরিবহণযোগ্য পানি পথের দৈর্ঘ্য ৪শ কিলোমিটার। বর্তমানে এর সিকি ভাগও সচল নেই। বিভিন্ন নৌরুটের বেশির ভাগ অংশ ক্রমাগত পলিজাত চড়া পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। ফলে ১৫ নৌরুট অচল হয়ে পড়েছে। এসব স্থানগুলো এখন মরুভূমির আমেজে দৃশ্যমান। ভরাটের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে খেয়াঘাট। অচল বা বন্ধ হয়ে যাওয়া নৌরুটগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাকালিয়া-ভাঙ্গুড়া, ঢাকা-বেড়া, ঢাকা-কুষ্টিয়া (ভায়া পাবনা), ঢাকা-পাবনা, ঢাকা-নগরবাড়ী, গোয়ালন্দ-বড়াল ব্রিজ, গোয়ালন্দ-বেড়া, কুষ্টিয়া-সাতবাড়িয়া, বেড়া-বড়ালব্রিজ এলাকা। কয়েক স্থানে ব্রিজ হওয়ায় এসব নৌরুট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

পাবনার নদীগুলো স্থিতিশীল নয়। নাব্য অংশ চিহ্নিত করে নদীর তলদেশ পরিস্কার রাখার তেমন প্রচেষ্টাও চালানো হয় না। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, ১৯৫০ খৃস্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পে পদ্মা ও যমুনার পানি প্রবাহের গতি পরিবর্তনের ফলে নদীর গভীরতা কমে যায়। এছাড়া ফারাক্কা বাঁধের কারণে পাবনার ২০টি নদীর মধ্যে ১৫টির মৃত্যু ঘণ্টা বেজেছে। বাকি ৪টি তে শীত-বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নৌ চলাচল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পাবনা প্রেসক্লাবের ইফতার অনুষ্ঠান

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার বিভিন্ন রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী নেতাদেরকে নিয়ে পাবনা প্রেসক্লাব চিরায়তধারায় ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান করেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার ও সম্পাদক জহুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, জেলা প্রশাসক ড. শাহেদ মোস্তফা, পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, জেলা বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউনিভার্সাল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সোহানী হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মশিউর রহমান খান, জেলা পরিষদের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা কাটেনি

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে থাকায় বাংলাদেশ ঘনঘন ভূমিকম্পের কবলে পড়ছে। গতমাসেও ১০টি ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে। যারমধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারির কম্পনটি পাবনাসহ দেশের অনেক স্থানে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এর আগে ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর ৫.৭ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, যা ৩০ বছরের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বড়। এতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের ঘটনাও ঘটে। পর্যবেক্ষণ তথ্য বলছে, গত ১৩ মাসে দেশে ছোট মাপের ৩২টি ভূমিকম্প হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৪৮

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

৮

শনিবার
১৪ মার্চ ২০২৬
২৯ ফাল্গুন ১৪৩২
২৪ রমজান ১৪৪৭

মুড়িকাটা পেঁয়াজ উৎপাদন হতাশ কেন চাষীরা!

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মুড়িকাটা পেঁয়াজ উৎপাদন করতে গিয়ে গভীর হতাশার মুখে পড়েছেন সাঁথিয়া অঞ্চলের চাষীরা। তারা পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা রাখলেও বর্তমান বাস্তবতায় বলছেন, 'পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তাঁদের এ পেঁয়াজের আবাদ ছেড়ে দিতে হবে।'

পাবনার সাঁথিয়া পেঁয়াজের ভান্ডার হিসেবে সারাদেশে পরিচিত। কৃষি বিভাগ থেকে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে এ উপজেলার ১৬ হাজার ৬৯০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৬১০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে মুড়িকাটা পেঁয়াজ। সংশ্লিষ্টরা জানান, এখানে মুড়িকাটা ও হালি পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। মুড়িকাটা পদ্ধতিতে অক্টোবর-নভেম্বরে আবাদ করা হয় এবং ডিসেম্বরের শেষ থেকে মার্চের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা হয়। অন্যদিকে হালি পদ্ধতিতে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আবাদ করে মার্চ-এপ্রিলে পেঁয়াজ তোলা হয়।

মুড়িকাটার উৎপাদন নিয়ে হতাশার ব্যাপারে কৃষকদের ভাষ্য, চলতি মৌসুমে মুড়িকাটা পেঁয়াজ বাজারে আসে প্রায় তিন মাস আগে। তখন প্রথম দিকে প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকায়। পরে দাম কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকায়। এরপর আবার বাড়তে বাড়তে তা ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকায় পৌঁছায়। এই দামে কৃষকেরা প্রতি মণে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা লাভ করছিলেন। কিন্তু গত মাসের মাঝামাঝি থেকে দ্রুত দাম কমতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তা নেমে দাঁড়ায় ১ হাজার টাকায়। ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয় আরও কম দামে- ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা মণ দরে। এমন দামে পেঁয়াজ বিক্রি করে হতাশ কৃষকরা।

তাঁদের কাছ থেকে জানা গেছে, গড়ে প্রতি মণ পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ হয়েছে ১ হাজার ৬০০ টাকা। সেখানে দাম নেমে যাওয়া বা খরচের দামও না পাওয়ায় এই পেঁয়াজের আবাদ করা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। অনেকে হতাশ হয়ে মাঠ থেকে পেঁয়াজ তুলছেন না। আবার অনেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। অনেকে বিক্রির হাট থেকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরছেন। তাঁদের ভাষ্য, লোকসান দিয়ে উৎপাদন চালু রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এ ক্ষেত্রে আবাদই বন্ধ করে দিতে হবে। কোন কোন আবাদী জানান, 'ধারদেনা করে পেঁয়াজের আবাদ করেছিলাম।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

চলে গেলেন সাংবাদিক ও কবি শুচি সৈয়দের মা হালিমা খাতুন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রথিতযশা সাংবাদিক ও কবি শুচি সৈয়দের মা হালিমা খাতুন (৭৬) গত ৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন (ইন্না-----রাজিউন)। এদিন সকাল সাড়ে ৬টায় রাজশাহী

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অমর একুশে

গণশিল্পী'র হাতেখড়ি উৎসব

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবারের মত এবারও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান করেছে পাবনার গণশিল্পী সংস্থা। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কামাল লোহানী প্রবর্তিত এ উৎসব অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধ শিশুদের মাঝে তুলে দেওয়া হয় স্লেট ও চক। এগুলো নিয়ে শিশুরা আঁকে বাঙলা বর্ণমালা। এই আঁকার উপর হয় প্রতিযোগিতা। সবশেষে প্রতিযোগী ছোট্ট শিশুদের লেখা মূল্যায়ন করে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার। সব অংশগ্রহণকারী শিশুদের দেওয়া হয় পুরস্কার। পুরস্কারে ছিল শিশুদের লেখা-পড়ার বই ও বিভিন্ন সরঞ্জাম।

গণশিল্পী সংস্থা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সকাল দুর্জয় পাবনা চত্বরে এ উৎসবের আয়োজন করে। ব্যতিক্রমী আয়োজনে শিশুদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে দুর্জয় পাবনা চত্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী ও গণশিল্পীর প্রবীণ সদস্য রওশন আক্তার। অন্যান্যদের মধ্যে সংগঠনের সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কুমার সাহা, মাহবুবুল আলম লিটন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সীমান্ত, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভৌমিক, অর্থ সম্পাদক আনিসুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক লিমন পারভেজ, শিল্পকলা সম্পাদক অঞ্জলি ভৌমিক প্রমুখ অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন।

'বিন্দু থেকে সিন্ধু'

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত খামারী আমিরুল

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

বিন্দু থেকে সিন্ধু- প্রবাদ মানেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বা সামান্য বিন্দু বিন্দু থেকেই বিশাল সমুদ্র বা বড় কিছুর সৃষ্টি করা। ঠিক এই কাজটি করেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার বুড়ামপুর গ্রামের আমিরুল ইসলাম।

মায়ের একটি সাধারণ ইচ্ছা পূরণ করতে ৩০ বছর আগে মাত্র ১৪,৬০০ টাকায় একটি শংকর জাতের গরু কিনেছিলেন আমিরুল ইসলাম। সেই একটি গরু থেকে আজ তিনি এক বিশাল খামারের মালিক, যেখানে রয়েছে শতাধিক গরু এবং দৈনিক দুধ উৎপাদন হয় অন্তত ৫০০ লিটার। আমিরুলের সাফল্য শুধু দুধ উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি তাঁর খামারকে রূপান্তর করেছেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেমে, যেখানে বর্জ্য বলতে কিছুই নেই। খামারের প্রতিটি বর্জ্য ব্যবহার করে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে প্রথাগত খামার ব্যবস্থার ধারণাকে পাল্টে দিয়েছেন তিনি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভিক্ষুকের ভিড়ে বেসামাল অবস্থা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সারা দেশের মত পাবনায়ও ভিক্ষুক বা হাতপাতা মানুষের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বেড়ে গেছে। পবিত্র রমজান মাসে তাদের ভিড়ে শহরাঞ্চলে অনেকটা বেসামাল অবস্থা তৈরি হয়েছে। রাস্তাঘাট, অলি-গলি সবখানে এইসব অসহায় মানুষের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে।

শহরে কেনাকাটা করতে আসা মানুষের অনেকেই জানিয়েছেন, স্বস্তিতে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। যেখানেই যাওয়া যাচ্ছে সেখানেই হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে দলে দলে অসহায় মানুষ। দান-খয়রাতের জায়গাগুলোতে রীতিমত হুলস্থুল কাণ্ড ঘটছে। জাকাত-ফিতরার লাইনগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে। সামান্য সাহায্য পাওয়ার আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দরিদ্র মানুষগুলো। এমনকি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য টিসিবির ট্রাকসেল কর্মসূচিতেও হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন মানুষ।

ওয়াকেবহাল অনেকের মতে, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে টানা কর্মসংস্থানের অভাব, মানুষের আয় কমে যাওয়া, দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বি ঊর্ধ্বগতি, সরকারীভাবে প্রদত্ত নানান সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাওয়া, দেশের কল-কারখানাসহ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো একেএকে বন্ধ হতে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

আলোকচিত্রে অমর একুশে পালন

অমর একুশের দিন অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (উপরে) এবং (নীচে) সপ্তাহব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনীতে তালপাতায় লেখা ৬০০ বছর আগের পাণ্ডুলিপি ও কয়েকশ' বছর আগের বিভিন্ন সময়ের কাগজে হাতেলেখা দুর্লভ সংরক্ষণের একাংশ। **–সম্প্রীতি বাংলাদেশ**

একুশের প্রথম প্রহরে পাবনা প্রেসক্লাব সদস্যদের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন।

পাবনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে পুলিশ প্রশাসন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মশিউর রহমান মন্ডলসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্তা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সূর্যমুখীর হাসিতে উজ্জ্বল টেবুনিয়া খামার

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

টেবুনিয়া কৃষি খামার উজ্জ্বল হলুদ সূর্যমুখী ফুলের সমারোহে নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। খামারের ৬.৫৭ একর জমি জুড়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধু সূর্যমুখীর হাসি। এমন দৃশ্য দেখতে পরিবার নিয়ে অনেকেই সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।

খামার সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা গেছে, রবি মৌসুমে (নভেম্বর-জানুয়ারি) সূর্যমুখী বপনের উপযুক্ত সময়। ফসল ঘরে তোলা যায় মার্চ-এপ্রিল নাগাদ। সে অনুযায়ী, টেবুনিয়া কৃষি খামারের ৬.৫৭ একর জমিতে এবার সূর্যমুখীর চাষ হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশ (বিএডিসি) এ চাষাবাদ পরিচালনা করছে। এই আবাদ থেকে ২ হাজার ৩শ কেজি সূর্যমুখী বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, সূর্যমুখী বীজ ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখে। রান্নার জন্য সয়াবিন বা সরিষা তেলের চেয়ে সূর্যমুখী তেল প্রায় ১০ গুণ বেশি পুষ্টিসমৃদ্ধ। শরীর সুস্থ রাখতে ও হাড় মজবুত করতে সূর্যমুখী তেল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সূর্যমুখীর বীজে ৪০-৪৫ শতাংশ লিনোলিক এসিড রয়েছে। এর তেলে ক্ষতিকারক ইরোসিক এসিড নেই। কোলেস্ট্রোল ফ্রি এই সূর্যমুখী তেল হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও সূর্যমুখীর খৈল গরু ও মহিষের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ ছাড়ানোর পর গাছের মাথাগুলোও গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গাছ ও পুষ্পস্তবক জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টেবুনিয়া খামারের নয়নাভিরাম হলুদ ফুলের দৃশ্য উপভোগ করতে সকাল-বিকেল অনেক লোকের ভিড় জমছে। পরিবার নিয়ে অনেকে ক্যামেরায় মনোরম দৃশ্য ধারণ করছেন। কারও কারও সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে, এমন প্রকৃতিক সৌন্দয়ের দেখা সব সময় মেলে না। তাই তারা এর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে নারাজ। তবে মানুষের এমন আনাগোনায় যে আবাদের ক্ষতি হচ্ছে- সে বিষয়টি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বলে খামার সংশ্লিষ্টরা জানান। তাছড়া মানুষের অবিরাম উপস্থিতি মৌমাছিকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কারণ প্রাকৃতিক পরাগায়ন না হলে ফুল থেকে সঠিকভাবে বীজ তৈরি হয় না। তাদের আশঙ্কা, জনসমাগমের এ ধারা অব্যাহত থাকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হতে পারে। তাই তারা বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য দর্শদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ করছেন।

মুড়িকাটা পেঁয়াজ

শেষের পৃষ্ঠার পর : এখন পেঁয়াজ বিক্রি করে খরচই উঠছে না। তাই ধারদেনা শোধ তো দূরের কথা, সংসার চালানোই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'

পর্যবেক্ষদের ভাষ্য, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পেঁয়াজের আবাদ থেকে চাষীরা সরে আসতে বাধ্য হবেন। তাতেকরে বাজারে যে বিরূপ প্রভাব পড়বে- যা ভোক্তাদের জন্য বড় আঘাত হয়ে দাঁড়াবে। এর ফল সরকার এবং দেশকেও ভোগ করতে হবে। সে কারণে দায়িত্বশীল মহলকে বিষয়টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ভাবা দরকার এবং আবাদী কৃষকের স্বার্থরক্ষায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

যদিও পেঁয়াজের বাজারে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে কৃষি অফিস সূত্র বলছে, সমস্যাটি সাময়িক। মাঠে থাকা পেঁয়াজের বেশির ভাগই পরিপক্ব হওয়ায় কৃষকেরা দ্রুত তুলেছেন। ফলে হাটে সরবরাহ বেড়েছে, কিন্তু সে তুলনায় ক্রেতার চাহিদা কম। এমনিতেই রমজানের শুরুতে পেঁয়াজের চাহিদা কিছুটা কম থাকে। এ মাসের প্রথম থেকেই হাটে নতুন হালি পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। এসব কারণে দাম কমেছে। পরে কৃষক দাম পাবে।

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত খামারী আমিরুল

শেষের পৃষ্ঠার পর : ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বাবার মৃত্যুর পর বিএসসি পড়ুয়া আমিরুল পড়াশোনা ছেড়ে পারিবারিক কৃষি কাজে যুক্ত হন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে মায়ের শখের বসে কেনা সেই একটি গরু থেকেই আজকের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম একটি স্থায়ী শেড তৈরি করেন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর খামারে গরুর সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। তাঁর খামারের প্রতিটি গরুই এখানেই জন্ম নেওয়া। বর্তমানে তিনি বছরে ৪০-৫০টি বাছুর বিক্রি করেন এবং খামারে সব সময় ১২০-১৩০টি গরু বজায় রাখেন।

?আমিরুল ইসলামের খামারটি এখন একটি আদর্শ মডেল। সরকারি প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) সহায়তায় এবং নিজস্ব বিনিয়োগে তিনি প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ বর্গমিটারের একটি বিশাল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন। ?এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বিশেষত্ব হলো, এটি পূর্ণ ক্ষমতায় চললে ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়। তিনি বায়োগ্যাস ব্যবহার করে দুটি জেনারেটরের মাধ্যমে ৩০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন, যা দিয়ে খামারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি চলছে। প্লান্টে গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট গোবর শুকিয়ে মেশিনের মাধ্যমে উন্নত মানের জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি কেজি সার ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সম্প্রতি সরজমিনে খামার পরিদর্শনের সময় আমিরুল জানান, তাঁর খামারে অপচয় বলে কিছু নেই। গোবর থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ হচ্ছে। আর অবশিষ্টাংশ থেকে তৈরি হচ্ছে উচ্চমূল্যের জৈব সার। পুরো প্রক্রিয়াটি পরিবেশবান্ধব এবং লাভজনক। আগামী তিন বছর সফলভাবে পরিচালনার পর এই প্ল্যান্টের বাণিজ্যিক লাইসেন্স পাওয়ার আশা করছেন আমিরুল। মনে করা হচ্ছে, এটা দেশের দুগ্ধ শিল্পে এক নতুন বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। আমিরুলের এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেখে উৎসাহিত হয়ে বুড়ামপুর ও পাকুড়িয়া গ্রামের প্রায় ২০-২৫ জন খামারি এখন নিজেদের খামারে ছোট ছোট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন। ঈশ্বরদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন জানান, আমিরুল ইসলাম এই অঞ্চলে 'মডেল ডেইরি ফার্মিং'-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর এই 'জিরো-ওয়েস্ট' মডেল শুধু লাভজনকই নয়, পরিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে নৌপথ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : দুরুহ হয়ে পড়ে। জেলার নদীপথ উচ্চমানের নয় বলে বছরব্যাপী সচলও থাকে না। নাব্যতা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সুচিন্তিত ব্যবস্থা কখনই নেয়া হয়নি। জিও, এনজিও সব পর্যায়ে জেলার নদীসমূহ সম্পর্কে একটা উদাসীন মনোভাব পোষণের কারণে আজ এই বিপর্যস্ত অবস্থা বলে ধারণা পাওয়া যায়।

এদিকে ৫ বছর ধরে কাজীরহাট ঘাটে ফেরি চলে না। পন্টুন পরিত্যক্ত। বেড়ায় নৌবন্দর পরিকল্পনা আংশিক রূপায়িত করার পর ঝুলে আছে ৯ বছর। তবে নদী পথে যাতায়াত আগের মত এখনও সুলভ। প্রতি লিটার জ্বালানিতে নৌপথে ২১৭ টন মালামাল পরিবাহিত হয় এক কিলোমিটার পথ। সেখানে সড়ক পথে ডিজেল ট্রাকে ১ লিটার জ্বালানিতে ২৫ টন মালামাল ১ কিলোমিটার বহন করা যায়।

পাবনায় ২০টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা নদীতে নৌপথ রয়েছে ৯০ কিলোমিটার। যমুনায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। নিয়মিত নদী ড্রেজিং না করায় নৌপথ কমতে কমতে তলানিতে এসে থেমেছে। জেলায় সারা বছর কতটুকু নৌপথ চালু থাকে- তারও জরিপ করা হয় না। বারো মাস পানি থাকে- এমন নদী পদ্মা ও যমুনাতেও সম্প্রতি বিশাল বিশাল চর জেগে ওঠায় চৈত্র- বৈশাখে মালামাল বহনকৃত বজরা আর দেখা যায় না। চাটমোহর, ফরিদপুর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলা মিলে বড়াল নদী রয়েছে মাত্র ৪৮ কিলোমিটার। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তাতে পানি থাকে না। এ নদীর গড় গভীরতা বর্তমানে তিন মিটারে দাঁড়িয়েছে। চার মাসও নৌকা চলে না। গোমানী নদীরও নাব্যতা থাকে না পাঁচ ঋতুতে। এক সময় বিদেশি বণিকেরা ফেরার পথে জাহাজ ভরে নিয়ে যেত কাঁচা রেশম ও রেশম জাত দ্রব্য, আর ঝিনুকের মুক্তা খচিত মনকাড়া অলঙ্কার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে চাটমোহর হান্ডিয়ালের ব্যস্ত বন্দরে এমন দৃশ্য ছিল নিয়মিত। ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে বন্দরটি।

বাঘাবাড়ীর কাছে গোমানীর বাম তীরে গোহালা নদীকে ধারণ করে এদের মিলিত প্রবাহ হুরাসাগর নামে পূব দিকে এগিয়ে যায় বর্ষাকালে। এ নদী পথে মিল্ক ভিটার সদস্যরা দুধ সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নৌপথ অচল হয়ে পড়ায় তরল দুধ সরবরাহে তাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শুকনো মৌসুমে গোহালা নদীকে মধ্যবর্তী একটি বিশাল চর বিভক্ত করে রাখে। কিন্তু বর্ষাকালে এই চর তলিয়ে গেলে নদী তখন আর বিভাজিত থাকে না। একত্রিত হয়ে যায়। তখন বাণিজ্যতরীর যাতায়াত বাড়ে।

সামান্য হলেও বর্ষাকালে পাবনায় পাট, মাছ, গুড়, গবাদি পশুসহ বিভিন্ন পণ্য এখনও ইঞ্জিনচালিত নৌকায় একমাত্র বেড়া থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে রফতানি করা হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নদী পথের নাব্য রক্ষা ও উন্নয়নে নটাখোলা ঘাট ও বাঘাবাড়ীর কাছে যমুনা ছাড়া আর কোথাও ড্রেজিং করা হয় না। বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে নৌপথ কমে যাওয়ায় গুরুত্ব কমে গেছে নৌযানেরও।

এদেশে নৌপথ উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে, অভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ গঠনের মাধ্যমে। এসময় ৩১ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে ২২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ৭শ মাইল নৌপথ জরিপ করা হয় পাঁচশালা পরিকল্পনায়। তখন দেশে নদী পথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪ হাজার ৪৮৪ মাইল। ১৯৬৪ তে নৌ চলাচলের উপযোগী নদী পথের দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ হাজার মাইলের বেশি। এসময় আরিচা-গোয়ালন্দ ও আরিচা-নগরবাড়ী ফেরি সার্ভিস চালুর ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর পরে আর এ জেলায় ইছামতি ছাড়া আংশিক নদী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। ১৯৯৮ খৃস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর সুজানগর ও রাজবাড়ীর মধ্যে ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু জৌকুড়া ঘাটের অবস্থা সংকীর্ণ। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে জেনারেল নেভিগেশন রেলওয়ে কোম্পানি পরিচালিত স্টিমার সার্ভিস প্রতিদিন পাবনা ও পাকশীর মধ্যে চলাচল করত। পদ্মার এই নৌপথ অতিক্রম করতে উজানে ৩ ঘণ্টা এবং ভাটিতে ২ ঘণ্টা সময় লাগত। গোয়ালন্দ হতে ভারতের বিহারের পাটনা পর্যন্ত যে স্টিমার চলাচল করত সেটা বাজিতপুর ঘাট হয়ে যেত। অপর দিকে যমুনা নদী বেয়ে নগরবাড়ী, ভারেঙ্গা, নাকালিয়া, স্থলচর, সিরাজগঞ্জ ও কালীগঞ্জ হয়ে আসাম প্রদেশে চলে যেত। এই সার্ভিস ছিল নিয়মিত। বাজিতপুর ঘাট থেকে পশ্চিম বাংলার দীঘা পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করত। বাজিতপুর-পাকশী ভাড়া ছিল ৭ আনা। পাবনা শহরে বিশ্বাস মোটর সার্ভিস চালু হওয়ায় ঈশ্বরদীর সাঁড়াঘাট ও কুষ্টিয়ার মধ্যে যাতায়াতকারী স্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রথম ধাক্কা আসে নৌ পরিবহণে।

যমুনা নদী জেলার পূব দিকে ৮০ মাইল সীমান্ত রচনা করে মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলাকে আলাদা করেছে। বর্তমানে যমুনায় বিশাল বিশাল চর ও বালিয়াড়ি জেগে উঠেছে। এ নদীতে বারো মাস নৌযান চলাচল করতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্ম-শীত ও বসন্তকালে বিঘ্ন ঘটে। নদীতে নাব্যতা থাকে না বলে স্থানে স্থানে ড্রেজিং করে নৌপথ চালু রাখা হয়। বছরের সকল সময় এ নদী দিয়ে বড় মালবাহী নৌকা লঞ্চ ও ফেরি চলাচল করে। যমুনা নদী দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। ইছামতি নদীর ৩০ কিলোমিটার পথ পরিত্যক্ত হয়ে আছে। পদ্মা নদী পাবনায় প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে প্রবাহিত। এ নদীতেও আগে স্টিমার, মালবাহী বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। পানির স্তর কমে যাওয়ায় ও লালনশাহ সেতু নির্মিত হওয়ায় এ নদীতে আর লঞ্চ বা বড় নৌকা চোখে পড়ে না। জেলার বিরাট এলাকা জুড়ে বছরের বেশির ভাগ সময় পানি মগ্ন থাকত। বর্ষাকালে স্বভাবতই প্রায় সকল রাস্তাঘাট ডুবে যেত। কয়েক বছর আগেও নৌপথই সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সড়ক পথের তুলনায় জলযানই জনপ্রিয় ছিল। পদ্মার শাখা নদী ও বিলের ওপর দিয়ে যে সব নৌকা চলাচল করত তার মধ্যে সারংগ, কোশা, ডিঙ্গি এবং পানসি উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র বর্ষাকালে চাটমোহর, ফরিদপুর ও ভাঙ্গুড়া এলাকায় শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে পণ্যবাহী নৌকা চলাচল করে। আগে বেড়া উপজেলা থেকে ভাঙ্গুড়ার বড়াল ব্রিজ পর্যন্ত লঞ্চ সার্ভিস চালু ছিল। পরে বন্ধ হয়ে গেছে। টিকে আছে কেবল নটাখোলা পাটুরিয়া। জেলার বড়াল, গুমানী ও চন্দ্রাবতীতে বর্ষাকালে মালবাহী নৌকা চলাচল করে। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে পানি থাকে না। ভরাট হয়ে গেছে আত্রাই নদী।

এ ছাড়াও পাবনার ইছামতি খেয়াঘাটে, চাটমোহরের হান্ডিয়ালে, সুজানগরের সাতবাড়িয়া ও ঈশ্বরদীর সাঁড়াঘাট ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র। পাবনায় যত নদী-উপনদী আর বিল আছে তা যোগ করলে পরিবহণ যোগ্য পানি পথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৪শ কিলোমিটার। বর্তমানে আর সিকি ভাগও সচল নেই বলে ব্যবসায়ীরা উৎকণ্ঠায় জর্জরিত।

পাবনা প্রেসক্লাবের ইফতার

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা সুলতানা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামারা তাসবিহা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মাসুদ খন্দকার, ক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবি, ক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লুৎফর রহমান, শহীদ বুলবুল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বাহেজ উদ্দিন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আবদুল গাফফার খান, পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস, কবি ও প্রাবন্ধিক মজিদ মাহমুদ, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি মোজাম্মেল হক কবির, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড পাবনা প্লান্টের পরিচালক আবদুল খালেক, আরিফপুর সদর গোরস্থান কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রব্বানী কামনা, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ডা. মনোয়ার উল আজিজ, রানা গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বিশ্বাস রানা, মাসপো গ্রুপের পরিচালক পনি বিশ্বাসসহ বিশিষ্টজনরা অংশ নেন। ইফতারের আগে দোয়া পরিচালনা করেন চাঁপা বিবি ওয়াকফ এস্টেট জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি ড. আবদুল্লাহ আল মামুন কাশেমী।

মশার হুঙ্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর : রাত ছাড়া এরা তেমন একটা বের হতো না। কিন্তু এখন কীসের রাত, কীসের দিন– কোন কিছুই পরোয়া করছে না। কোন রাখঢাক না রেখে হামলে পড়ছে মানুষের উপর। রক্ত চুষে টইটুম্বুর হয়ে ফিরছে। অসহায় মানুষ হাপিত্যেশ করে মরছেন। কেও যেন দেখার নেই, কেও যেন বাঁচাবার নেই! এই বাস্তবতা এখন সবখানে। অফিস-আদালত, বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ সবখানে অবাধে বিচরণ করছে মশা। মানুষের রক্ত চুষে অনেক ক্ষেত্রেই শরীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ডেঙ্গুর জীবাণু। মশার এই বাড়-বাড়ন্ত সম্পর্কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার গণমাধ্যমকে বলেন, 'মশক নিধনে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় খাল-বিল-ডোবায় বংশবিস্তার করছে কিউলেক্স মশা। আবার প্রশ্ন উঠেছে মশার ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও।' তিনি উল্লেখ করেন, 'মশার প্রকোপ এখন প্রতিদিনই বাড়বে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। তাই এ পরিস্থিতিতে কিউলেক্স মশার বংশবিস্তার কমাতে ড্রেন, ডোবা, নালা, খাল পরিষ্কার করে লার্ভা ধ্বংসকারী লার্ভিসাইড প্রয়োগ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এডিস ও কিউলেক্স মশার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলাদা। তাই দুই ধরণের মশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমন্বিত বিজ্ঞানভিত্তিক মশক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। ৮০ শতাংশ এডিস মশার জন্ম হয় তিন জায়গায়। নির্মাণাধীন ভবনের পানি জমে থাকা মেঝেতে ৪৭ শতাংশ, বাড়ির নিচতলায় ১৭ শতাংশ এবং প্লাস্টিকের ড্রামে ১৫ শতাংশ এডিসের লার্ভা পাওয়া যায়। এই জায়গাগুলো নির্দিষ্ট করে মশার ওষুধ ছিটাতে হবে। এটাকে বলা হয় টার্গেট স্পেসিফিক মসকুইটো কন্ট্রোল। পরিকল্পনা করে কাজ কলে মশা নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, তিনটি সক্রিয় (ইন্ডিয়ান, ইউরেশীয় এবং বার্মিজ) টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে থাকায় বাংলাদেশ উচ্চ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। প্রধান সক্রিয় ফল্টগুলোর মধ্যে উত্তর-পূর্বে ডাউকি ফল্ট, মধুপুর ফল্ট এবং আসাম ফল্ট অন্যতম। এ কারণে এরইমধ্যে অনেকগুলো ভূ-কম্পন অনুভূত হলেও সামনে বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা এখনও রয়ে গেছে। পাবনাও ভূমিকম্পের সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থলের তালিকায় রয়েছে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকা জরুরি। গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পাবনা, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দুপুর বেলা ২৯ সেকেন্ডের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৪। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায়। এর আগেরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা ৪ মিনিট ৫ সেকেন্ডের মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে প্রায় ৪৫৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভারতের সিকিম অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৬। তার আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টা ৫১ মিনিটে আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ১। এর উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ৪৬২ কিলোমিটার পূর্বে। মিয়ানমারে উৎপত্তি হওয়া মাঝারি মানের এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ১।

চলে গেলেন সাংবাদিক

শেষের পৃষ্ঠার পর : মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

হালিমা খাতুন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত সেবা তত্ত্বাবধায়ক (নার্সিং সুপার) ছিলেন। পাবনার মানুষ হলেও তিনি চাকরি সূত্রে রাজশাহীতে বসবাস করতেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হালিমা খাতুনের একমাত্র ছেলে ইসমাইল হোসেন (শুচি সৈয়দ) বর্তমানে সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সম্পাদনা পর্ষদে আছেন এবং তিনি জাতীয় দৈনিক যুগান্তর-এর সহকারী সম্পাদক।

প্রয়াত হালিমা খাতুনের মরদেহ ওইদিনই পাবনার ঈশ্বরদীস্থ পিয়ারাখালী গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয় এবং বাদ মাগরিব স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে পিয়ারাখালী গোরস্তানে দাফন করা হয়। তাঁর প্রয়ানে স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষিদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

সম্প্রীতির শোক : শুচি সৈয়দের মায়ের মৃত্যুতে সম্প্রীতি পরিবার, সম্পাদনা পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান।

ভিক্ষুকের ভিড়ে

শেষের পৃষ্ঠার পর : থাকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামার কারণে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত অভাবী মানুষের সংখ্যা আগের চেয়ে কয়েকগুন বেড়ে গেছে। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) গত বছরের আগস্টে যে তথ্য উপস্থাপন করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ মানুষ দরিদ্র, ২০২২ সালে এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। সূত্র জানায়, গত বছরের আগস্ট পরবর্তী বর্তমান সময় পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের হিসাব ২৮ শতাংশ ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। যার ফল পরিলক্ষিত হচ্ছে হাতপাতা মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় থেকে। সূত্র মতে, এমন বাস্তবতায় সরকার থেকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

আশরাফ আহমেদ মুক্তা

পূর্বসূত্র : ১৯৬৮ সালে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। একই বছর এপ্রিল মাসে আব্বার বদলি হয় দিনাজপুর থেকে পাবনার উল্লাপাড়া থানায়। ওসি হিসেবে তিনি সেখানে যোগ দেন। দু'মাস পর আবার তাঁর বদলি হয় বেড়া থানায়।

আমার ছোট তিন ভাইবোন তখন বেড়ার স্কুলে ভর্তি হয়। তারা নৌকায় করে স্কুলে যেত। আমি প্রায়ই ছুটিতে রাজশাহী থেকে পাবনায় যেতাম। বেড়া থানা ছিল একদম নদীর ধারে। থানার পাশেই ছিল আমাদের ওঠা-নামার বড় নৌকা- 'ওসির নৌকা'।

সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমি গিয়ে নৌকায় বসতাম। মাঝি নৌকা বেয়ে অনেক দূর নিয়ে যেত। দুই পাড়ের গ্রামগুলোতে তখন বিদ্যুৎ ছিল না- তবু কোথাও কোথাও মিটিমিটি আলো জ্বলত। নদীর ওপর সেই নরম আলো, নিস্তব্ধ প্রকৃতি- সব আজও স্মৃতিতে অমলিন।

নগরবাড়ি ঘাটের পাশে থানার একটি বড় লঞ্চ নোঙর করে রাখা থাকত। বহুবার আমি সেখানে রাত কাটিয়েছি। বসে বসে দেখতাম- ঘাটে মানুষ উঠছে, নামছে; গাঙচিল হঠাৎ পানিতে ডুব দিয়ে মাছ ধরে আবার উড়ে যাচ্ছে। সে সব দৃশ্য আজও চোখে ভাসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে পরিচয় হয় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, এঁরা পাবনার জিয়াউল ইসলাম হেলালী, শিবজিত নাগ, সৈয়দ সরোয়ার হোসেন রেণু, ড. সালমা জুবেরী রুনু, সুফিয়া খাতুন আরজু এবং ফেরদৌস খান চিনু। আরও অনেকের নাম ভুলে গেছি। এঁরা সবাই আমার সহপাঠী। বন্ধুত্ব আজও অটুট।

বেড়া থেকে ফেরার পথে প্রায়ই যাত্রাবিরতি করতাম পাবনা শহরের শিবজিতের আবদুল হামিদ রোডের বাড়িতে। মাসী আমাকে খুব আদর করতেন। তখন শিবানীও জীবিত। অসাধারণ গান করত।

পাবনায় আরেকটি প্রিয় জায়গা ছিল শিবজিতের বাড়ির উল্টো দিকে 'লক্ষ্মী ভান্ডার'। আড্ডা দিতে দিতে মিষ্টি খেতাম। ধীরে ধীরে ওই এলাকার বহু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অনেকেই আব্বাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

রাজশাহীতে আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই থাকতেন সুনীল গাঙ্গুলীর ছোট বোন বীনা পিসি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল পাবনার পরিচিত ব্যোমকেশ লাহিড়ির পরিবারের সঙ্গে। এই সূত্রে পাবনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এভাবে বহু মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক আজও অটুট। এত বছর পরেও যোগাযোগ রয়ে গেছে, যা সত্যিই এক বড় আশীর্বাদ।

রাজশাহীতে তখন আমি একা থাকতাম। আব্বা অনেক চেষ্টা করে অবশেষে রাজশাহীতেই বদলি নিলেন-ডিআইজি অফিসে। আমার ভাইবোনদের পড়াশুনার সুবিধার জন্যই তাঁর এই চেষ্টা।

তারপর এল উত্তাল সময়- ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন। সেনাবাহিনীর হাতে প্রফেসর জোহার নির্মম হত্যার টনায় সারা রাজশাহীতে অস্থিরতা। তারপর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। আমাদের মনে তখন স্বাধীনতার আগুন জ্বলে উঠেছে। ঠিক এই সময়েই বড় দুঃসংবাদ এলো। আব্বার আবার বদলি। ১৫ মার্চ তাঁকে দিনাজপুরে পাঠানো হলো। নানা কষ্টের মধ্যেও তিনি দায়িত্ব নিলেন।

মার্চ ১৯৭১ : আমরা তখন তরুণ যুবক। আম্মাকে নিয়ে আমরা চার ভাইবোন রাজশাহীর কাজিহাটার বাড়িতে থাকি। আব্বা দিনাজপুরে পোস্টেড। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই চারিদিকে আন্দোলনের জোয়ার। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড ইয়ার অনার্সে পড়ি; মনজু কলেজে; আনজু আর রনজু স্কুলে। বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ক্লাস বন্ধ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। আমরা মিছিলে অংশ নিচ্ছি, ডামি বন্দুক নিয়ে ট্রেনিং করছি।

অবশেষে এলো ২৫ মার্চের কালরাত্রি। নিদ্রাহীন রাত শেষে জানতে পারলাম চারদিকে মৃত্যু আর ধ্বংস। কিছুদিনের জন্য শহর স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতে আসে। খবর পেলাম- আর্মি নগরবাড়ি ঘাট পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। রাজশাহীতে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে ঠিক করলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাব। সেখানে আছেন ছোট মামা, আছেন নানা। আমরা সবাই নবাবগঞ্জে নানার বাড়িতে উঠলাম। আমার ছোট মামা তখন ওখানকার সদরের এমপি। কয়েকদিন সেখানেই আশ্রয়।

একদিন দেখি- অসংখ্য কষ্ট সহ্য করে আব্বা দিনাজপুর থেকে চলে এলেন। আমাদের সুখ আর আনন্দের সীমা রইল না। হঠাৎ একদিন ছোট মামা তাঁর দলবল নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিলেন। আমরা নানার গ্রামের বাড়িতে চলে এলাম। কারণ খবর আসছিল যে চাপাইনবাবগঞ্জ শহরে আর্মি ঢুকে পড়েছে।

মে মাসের মাঝামাঝি- এক সন্ধ্যায় আব্বা আমাকে ডেকে পাঠালেন। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। এর আগেও আমরা তিনজন- আব্বা, মনজু ও আমি সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ঠিক ছিল- আম্মা ছোট দুই ভাইবোনকে নিয়ে নানার কাছে থাকবেন। আব্বার ধারণা ছিল একবার কলকাতায় পৌঁছাতে পারলে রাজশাহী কলেজের তাঁর রুমমেট ও সহপাঠী ডা. জয়নাল আবেদীন (তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী) ব্যবস্থা করে দেবেন। আব্বা মুজিবনগর সরকারে যোগ দেবেন, আর আমরা দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারব। কিন্তু ভাগ্য সহায় হলো না। পায়ে হেঁটে অনেক কষ্ট করে বর্ডারের খুব কাছাকাছি গিয়েও ফিরতে হলো। নদী পার হওয়া গেল না। আর্মিরা নৌকাগুলো ডুবিয়ে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না।

কয়েকদিন পর পিস কমিটির লোকজন জুম্মার নামাজ শেষে নানার বাড়িতে এসে আব্বাকে বললো, 'আপনি আমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন- আমরা সম্মান করি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সবাইকে কাজে যোগ দিতে বলেছে। আপনি যোগ না দিলে আমাদের বিপদ হবে। বাধ্য করবেন না- আপনাকে তুলে দিতে হবে।' আব্বা বুঝলেন- আর উপায় নেই। তাঁকে কাজে যোগ দিতেই হবে। এ অবস্থায় নিজের কাছে থাকা রিভলভার আর ৫৪ রাউন্ড গুলি আমাকে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বড় ছেলে, কী করবে- তুমি জানো। তুমি এগুলো জমা দিতে যেও না। আমার এক সহকর্মী ইন্সপেক্টর জমা দিতে গিয়ে আর্মির হাতে মারা গেছে। ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে।'

পরদিন ভোরে দোয়া-দরুদ পড়ে মাথায় টুপি দিয়ে অন্যদের সঙ্গে সাইকেলে চাপাইনবাবগঞ্জে রওনা হলেন। দুই-তিন দিন কাজ করার পরে তাঁকে বলা হলো- রাজশাহীতে যোগ দিতে হবে।

রাজশাহীতে তিনি একাই রওনা দিলেন ঘোড়ার গাড়ির টমটমে চড়ে। অন্য কোনো যানবাহন চলাচল করছিল না। এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত- কারণ এর সঙ্গে জড়িত ছিল তাঁর জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি। আমাদের সবার কাছ থেকে খুব কষ্টে বিদায় নিয়ে তিনি রওনা দিলেন অনিশ্চিতের পথে।

আমরা তাঁর খোঁজে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছি। ফোন নেই, চিঠিও আসা-যাওয়া বন্ধ। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে- আর আমরা আব্বার কোনো খবর পাচ্ছি না।

ঠিক এমন সময় একদিন সন্ধ্যার আগে আমার খালু রাজশাহী থেকে নানার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। মুখ গম্ভীর। নানার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ চলল। আমাদের সেখানে যেতে দেয়া হচ্ছিল না। বুঝলাম- ভয়ংকর কোনো খবর। অবশেষে আম্মার জোরাজুরিতে আমি ঢুকতেই খালু বললেন, 'তোমরা এখনও বুঝতে পারোনি? তোমাদের আব্বাকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে। আর কোনো খবর নেই।'

আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জীবনে প্রথমবার সেই রাতটি কাটলো সম্পূর্ণ জেগে, কান্নায়, আতঙ্কে, অসহায়তায়। আমরা চার ভাইবোন আম্মার গায়ে লুটিয়ে কাঁদছি। ভাবছি- আব্বা যদি ফিরে না আসেন তবে আমাদের দিন কীভাবে চলবে। সারারাত কেঁদেছি।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : বিনিদ্র রজনী কাটলো। পরদিন সকাল বেলা আমার মনে আছে- আম্মা স্থিরভাবে বললেন, 'আব্বা, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাজশাহী চলে যাচ্ছি। আমার অনেক কাজ। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে মুক্তার আব্বাকে।' আম্মা কিভাবে এত শক্ত হলেন? কোথা থেকে এত শক্তি পেলেন এভাবে- সেকথা এখনো ভাবি। আমার মনে আছে, বালিয়াডাঙ্গা থেকে চাপাইনবাবগঞ্জ গরুর গাড়িতে রওয়ানা হলাম। সারা রাস্তায় দোয়া-দরুদ পড়েছি। আমি লুঙ্গি পরা, মাথায় টুপি, হাতে ওজিফার একটা বই। আমার সঙ্গে মনজু। আম্মার সঙ্গে গাড়ির মধ্যে আনজু আর রনজু। ইপিআর-এর কল্যাণপুর ক্যাম্প পার হবার সময় ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওরা আমাদের কিছু বলল না। আমরা ট্রেনে উঠে গেলাম। রাজশাহীর কাদিরগঞ্জে খালার বাসায় আমাদের আশ্রয়। খালু অদ্ভুত মানুষ। তাঁর এতগুলি ছেলেমেয়ে। নিজের খাবার জোটাতে ওনার প্রাণান্ত। হাসিমুখে আমাদেরকে গ্রহণ করলেন। আম্মাকে বললেন, 'আমাদের যদি খাওয়া হয়, তোর ছেলেমেয়ের খাবার অভাব হবে না।' আমাদের খালু কাজী আবদুল মুত্তালিবের মত মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি আমি দেখিনি। ওনাকে দেখেছি খুব ভোরবেলা উঠে নামাজ পড়ে পাঞ্জে সুরার একটা বই হাতে নিয়ে কোরআন তেলওয়াত করছেন।

খালু আজ আর আমাদের মাঝে নাই, কিন্তু উনার ও খালামার এই অবদান আমাদের পরিবার সারাজীবন মনে রাখবো। আমরা কি করব- আমার হাতে কোন টাকা পয়সা নাই। ব্যাংকে টাকা পয়সা ছিল কিনা সেটা আমাদের জানা নাই। এই অবস্থায় কে আমাদেরকে সাহায্য করবে- এই ভেবে আকুল। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম রেডিওতে গিয়ে ওখানকার রিজিওনাল ডাইরেক্টর সাইফুল্লাহ সাহেবের সংগে দেখা করি। আল্লাহর নাম করে আমি একদিন রাজশাহী রেডিওতে গেলাম। ওখানে আমার অনেকেই পরিচিত, কারণ আমি রেডিওর অনেকদিনের নাট্যশিল্পী। ভয় ছিল উনি আমার মত একজন নগণ্য নাট্যশিল্পীর সংগে দেখা করবেন কিনা। উনি আমাকে চিনতেন। আব্বাকেও ভালোভাবে চিনতেন। উনার মেয়ে আমার প্রয়াত বোনের সঙ্গে পড়তো। উনাকে স্লিপ পাঠালাম এবং দেখা করবার অনুমতি পেলাম। আমি উনাকে সব খুলে বললাম। আব্বার নিখোঁজ হবার কথা, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা এবং পরিশেষে আমার নিজের নিরাপত্তার কথা- উনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমাকে উনি বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি যেন অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে তোমার অডিশন নেয়া হয়। অনুষ্ঠান ঘোষণায় তোমাকে আমি সারা মাসের প্রোগ্রাম দিব, যাতে তুমি একটা ভালো অ্যামাউন্ট পাও। সেটা দিয়ে তোমাদের সংসার কোনভাবে চালাতে পারবে।'

আমি রেডিওতে কাজ শুরু করলাম। উনি আমাদের জন্য বিরাট ঝুঁকি নিলেন। উনি একজনকে সুযোগ করে দিলেন, যার বাবা মিলিটারির হাতে বন্দী। উনি তো পাকিস্তানপন্থী। কেন এই ঝুঁকি নিলেন? তার উত্তর আমি মেলাতে পারিনি। হয়তো আল্লাহই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

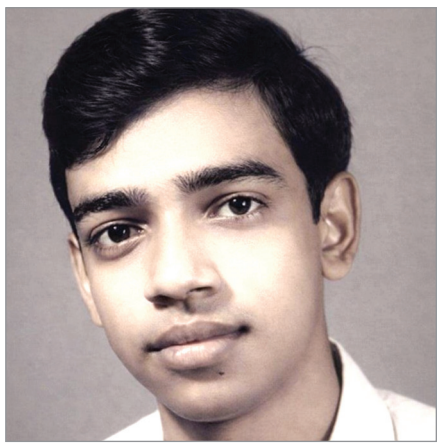

পিতা আলতামাস উদ্দিন আহমেদ, চাকরী জীবনের শেষ দিকে (১৯৪৯-১৯৮১) ও আমি আশরাফ আহমেদ (রাবিতে ১৯৭৩ সাল)

আহমেদ পরিবার (সম্ভবত ১৯৯৭ সাল)

অনুষ্ঠান ঘোষণার কাজে রেডিওতে লম্বা সময় থাকতে হয়। একটা পরিচয়পত্র পেলাম (মিলিটারিরা যেটাকে বলতো ডান্ডি কার্ড) যেটা আমার জন্য ওই সময়ে রক্ষাকবচ ছিল। রেডিওতে কাজ করার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের অনেক খবর পেতাম। প্রচুর মিলিটারিদের আনাগোনা ছিল। যুদ্ধে মার খেলে বিমর্ষ থাকতো। সেই সময়ে টেলিভিশন ও রেডিও খুব গুরুত্ব বহন করত- কারণ এ ছিল সরকারের প্রচারযন্ত্র। দেখেছি রিজিওনাল ডাইরেক্টরকে আর্মি অফিসাররা পর্যন্ত খুব সমীহ করে চলত। ফুল কর্নেলের নীচে কোন অফিসারের সঙ্গে উনি দেখা করতেন না।

বেতার ভবনে যুদ্ধের সময়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গেলে বিরাট এক পরিচ্ছদ হয়ে যাবে। যাই হোক, প্রথম মাসের চেক পেলাম। আমার মনে আছে ২২০ টাকা। যেটা পাকিস্তান আমলে খুব কম টাকা নয়। আম্মার হাতে তুলে দিলাম পুরো টাকা। আম্মা আমার প্রথম রোজগারের টাকা পেয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন।

কিছুদিন যাবার পরে খালু-খালামাকে বুঝিয়ে আমাদের কাজিহাটার বাসায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ আর কতদিন উনাদেরকে কস্ট দিব? যে মহানুভবতা উনারা দেখিয়েছেন তার তুলনা নাই। উনারা পাশে না দাঁড়ালে আমরা তো ভেসে যেতাম।

শুরু হল আমাদের চার ভাইবোন ও আম্মার একলা জীবন সংগ্রাম। আমি বড়, কতই বা আমার বয়স ২১ বছর, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনাল ইয়ার অনার্সে পড়ি, বাকী ভাইবোনেরা চার থেকে সাত বছরের ছোট। রেডিওর অনুষ্ঠান, আর বাকি সময়টা বেশিরভাগ সময় আমার মনে আছে- আমি বিকেলের দিকে শাহ?? মখদুম সাহেবের দরগায় চলে যেতাম। ওখানে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহ?র কাছে কান্নাকাটি করতাম। আমদের অসহায় অবস্থা। পারলে তৃণ পেলেই আকড়ে ধরি। পীর, ফকির, ওঝা- যে যেটা বলেছে, সেখানেই গেছি আব্বার খবর পাবার জন্য। আমাকে অনেক সংগ দিত খালাতো ভাই, আমার বয়সী মারজুক। বাসায় থাকলে দেখি আম্মা কাঁদছেন, ভাই বোনেরা বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। চিন্তা করি, আব্বা না ফিরলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? কি ভাবে এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিব? আমার কিন্তু কেন যেন মনে হত- আব্বা আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।

আমার দাদা গ্রাম থেকে এলেন। বৃদ্ধ মানুষ। আমার মাকে নিয়ে বোরখা পরিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাওয়া শুরু করলেন। পুলিশ অফিসে, যেখানে আব্বা চাকরি করতেন- সেখানে দেখা করলেন। খুব একটা ভালো আশ্বাস পেলেন না। বরঞ্চ ভারপ্রাপ্ত এসপি বললেন যে, আপনি ফিরে যান এবং মৃত মানুষের জন্য যেটা করতে হয় সেটাই করেন।

এখানে এসে লাভ নাই। আমার মা খুব বেশি শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু উনার মধ্যে যে জেদ আমি দেখেছি তাতে বিস্মিত হয়েছি। উনি এর শেষ দেখতে চাচ্ছিলেন।

একদিন আমার দাদাকে নিয়ে মা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিরী হাউসে গেলেন। এখানে আর্মি ক্যাম্প ছিল এবং উর্ধ্বতন অফিসাররা বসতেন। আম্মার কাছে শুনেছিলাম, ওনাকে এবং দাদাকে একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছিল অনেকক্ষণ। পরে উনাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে দেখা করাতে। অফিসার বলেছিলেন, আমাকে ডিটেলস দিয়ে যাও। যদি সম্ভব হয় আমি দেখবো বেঁচে আছে না মারা গেছে- এরকম আমাদের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা। আমাদের কাছে এসেছিলো কিনা তোমার স্বামী। পরে খোঁজ নিও।

আম্মা খোঁজ নিতে যেতেন। আর ফিরে আসতেন। এইভাবে প্রতিদিন ফিরে এসে কান্নাকাটি করতেন। খালু আম্মাকে গাইড করতেন কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে। আমার মনে আছে, ১৯৭১ সালে রাজশাহী শহরে পিস কমিটিতে যারা ছিলেন তাদের সংগে বিভিন্ন আত্মীয়দের মাধ্যমে আম্মা দেখা করেছিলেন সাহায্যের আশায়। কিন্তু কেউ কোনো সাহায্যে আসেনি। আমি কোথাও যেতে পারতাম না আম্মার সঙ্গে। কারণ আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ বয়সের ছেলেরা যুদ্ধ গেছে- তাই ওরা এই বয়সের সবাইকে খুব সন্দেহের চোখে দেখে। আমি গেলে মেরে ফেলবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

স্মৃতি কথা একাত্তর

আবুল হোসেন খোকন

আমাদের একটা ক্ষুদে দল। সবার ভাবনা- আমরা একদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। বেশ ঝাঁঝালো স্বপ্ন। স্বপ্নটাকে আমরা কাছে টানি, হাতের মুঠোয় নিয়ে আসি। স্বপ্নটা যেন হয়ে যায় পুতুল খেলা। আর প্রতিদিন চলে তারই মহড়া। কিরণ, করিম, সেলিম, শরীফ, কয়েস, মান্নু, রুম, জামাল, জাকির, আজীজ, হাকিম, শফি, সুবির, লাল, চন্ডি, রবিউল হল দলের সদস্য। বাড়ি থেকে ডিগ্রি কলেজের দূরত্ব এক ফার্লং। বিকেল হওয়া মাত্রই দলের সদস্যরা পৌঁছে যায় সেখানে।

একটি পুকুর। পূবে পাশাপাশি দু'টি একতলা দালান। পশ্চিমটা ফাঁকা। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঠিক উত্তর-পূর্ব কোণায় তিনতলা ডিগ্রি ভবন, উত্তরে আরেকটি একতলা। এখানেই- পশ্চিম কোণায় ইটের পাহাড়, সারিসারি সাজানো। নতুন ভবন তৈরির জন্য ফেলে রাখা হয়েছে বহুদিন। জংলী গাছ আর আগাছায় ঢেকে গেছে প্রায় সব। এটাই আমাদের রণাঙ্গন ।

লাঠি আর কাঠের ভাঙ্গা টুকরো হলো আমাদের বন্দুক। খেলার নাম 'ফাইটিং মার কুক'। একজন বিচারকের মাধ্যমে দল ভাগ হয়। বিচারক গলা চিঁড়ে 'কু-উ-উ' করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দলের সবাই ছিটকে যায়, ইটের ফোঁকরগুলোতে গা ঢাকা দেয়। চিকন ফাঁক গলে গলে চলে যায় এক একজন অনেক গভীরে। সহজে কাউকে খুঁজে পাবার জো-টি নেই। তারপর বিচারকের দ্বিতীয় দফা সংকেত 'কু-উ-উ'। শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। গেরিলা কায়দায় গোপন স্থান থেকে সতর্ক বিড়ালের মত বেরিয়ে আসা, তারপর সম্মুখে শত্রু পক্ষের কাউকে দেখা মাত্র 'ঢিশুম'। হাতের বন্দুক বাগিয়ে ধরে মুখ থেকে ঢিশুম শব্দ বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ খতম হয়ে যায় এবং আপনা-আপনি সে উঠে চলে যায় বিচারকের কাছে। হয়ে যায় দর্শক। এদিকে আরও যুদ্ধ চলে, শত্রু নিধন হয়। এক সময় এক পক্ষের সবাই শেষ হয়ে যায়। অন্য পক্ষের যে ক'জন বেঁচে থাকে- তারাই হয় বিজয়ী। প্রতিদিন আমাদের এই মহড়া চলে। এ যুদ্ধ দেখে থমকে যায় পথিক। বিস্ময়ে চেয়ে দেখে। বলে, 'বা বেশ বেশ!' অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ঠিক দেখে নিও, এরাই হবে একদিন যোদ্ধা।'

পাড়াটা মজুমদার পাড়া বলে পরিচিত। পাবনা শহরের রাধানগর গ্রামে এ পাড়া। এক সময় পাড়ার বেশ নাম-ডাক ছিল। হিন্দু জমিদারদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বাস করতো। সাধারণের মধ্যে পালদের বসতি ছিল। এই পাল এখনও আছে। জমিদারের প্রাসাদ নেই; কিন্তু বাড়ি-ঘর-পুকুর আছে। এ সব কিছুকেই বলা হয় মজুমদার বাড়ির অবশেষ। আর পাল বলতে এখন যে টিকে আছে, তার নাম হারাণ পাল।

প্রতিমা বা ঠাকুর বানানোই তাঁদের কাজ। আমাদের বাড়ির শ'দুয়েক গজ দূরে উত্তর-পূর্ব কোণায় বাড়িটা। বাড়ির সবাই প্রতিমা বা ঠাকুর বানাতে ওস্তাদ। এই ঠাকুর এখান থেকে শুধু পাবনা নয়, গোটা পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতে পর্যন্ত সরবরাহ হয়। শুনেছি উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বায়না আসে ঠাকুরের।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে রথঘর। রথের মেলা শুরু হলে কালো তেকোণা ঘর থেকে টেনে বের করা হয় ওই রথ। সারা বছর ঘরেই আবদ্ধ থাকে ওটা। এই রথঘর থেকে পশ্চিমে কিছুদূর ডানে ছোট পথ চলে গেছে উত্তরে। খানিক পরই তেমাথা। পূব-পশ্চিম কোণার বিরাট জোংলা বাড়িটা আমাদের। ঠিক পিছনেই হাজী কুটির। সেখানে থাকে বন্ধু শরীফ, রুম, আজীজ। ওদের বাড়ির উত্তর মুখে চলে গেছে আরেকটি সরু পথ। এই পথের দু'ধার দিয়ে কয়েস, মঞ্জু, চন্ডি, করিম, জামাল, জাকিরদের বাড়ি। এই উত্তরমুখো পথটি মিলেছে পূব-পশ্চিম মুখি আরেকটি পথে-ঠিক ইছামতি স্কুলের সঙ্গে। এই ইছামতি স্কুলের মাঠে বড়দের আড্ডা। দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম। আড্ডায় সবকিছু আলোচনা হয়। বিকেলে সবাই দলে দলে আসে। দেশের খবর নিয়ে বৈঠক করে- কী করা হবে সিদ্ধান্ত নেয়। একেকজন বিভিন্ন জায়গার খবরগুলো পরিবেশন করে। এসব শোনার জন্য মাঠে লোক ভরে যায়। বৈঠক-আলোচনা ছাড়াও এ মাঠে চলে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। বন্ধু সেলিমের বড় ভাই সানাউল্লাহ এই প্রশিক্ষণের ড্রিল মাস্টার। একদল একদল করে ছেলেদের নিয়ে মার্চ পাস্ট করানো হয় প্রতিদিন। যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হচ্ছে ছেলেদের। আমরা বড্ড ছোট বলে হা করে তাকিয়ে দেখি। চিৎকার করে সানা ভাই বলেন, 'লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট'। আমাদের কানে শুনি 'হাফ হাইট হাফ, হাফ হাইট হাফ'। তালে তালে পা পড়ে সবার, পাথরের মত শক্ত ওদের মুখ। হাতের লাঠিগুলো রাইফেলের মত ঝুলিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যায় ওরা। বড্ড ভাল লাগে। মুক্তিযোদ্ধা হতে ইচ্ছে করে। কিরণের বাবার নাম জয়নাল পোদ্দার। মাঝে মাঝেই তিনি আসেন স্কুল মাঠে। যুদ্ধপ্রস্তুতির বিভিন্ন আয়োজন দেখেন এবং নিজের মত কিছু পরামর্শ জারি করেন। তিনি সবাইকে ঠিকমত তৈরি হতে বলেন। স্কুলের পিছনের দিকে বাস করেন আবু মিয়া বলে আরেকজন বড্ড রগচটা লোক। তিনিও প্রায়ই উপদেশ-নির্দেশ দেন।

আজ বিকেলটার ঘটনা অন্য রকম। স্কুল মাঠ ভর্তি লোক। জনসভার মত ছড়ানো ছিটানো সবাই। অনেক জায়গায় থোকা থোকা জটলা। এই জনসভার এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত নেচে বেড়াচ্ছে শক্ত শক্ত খবর।

একটি জটলায় আবু মিয়া ক্রুদ্ধ চোখ মুখ পাকিয়ে বলছেন, 'পাঞ্জাবীরা হামলা শুরু করেছে। গাছ ফেলে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দাও। গোলার (এডওয়ার্ড কলেজের মোড় বটতলাকে বলা হয় গোলা) রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বন্ধ করো। হাকিমুদ্দির স'মিল থেকে গাছের সব গুঁড়ি বের করে নাও।' তিনি পশ্চিমের ডাকবাংলো সড়ক দেখিয়ে বললেন, 'এই পথে মিলিটারীরা আসতে পারে, পথ বন্ধ করে দাও। দরকার হলে পথ কেটে কেটে গর্ত করে রাখো।' আবু মিয়ার নির্দেশ মত অনেকে চলে গেল। একেক জটলায় একেক খবর। কোথাও খবর, 'মিলিটারীরা গুলি চালিয়েছে।' কোথাও খবর, 'অনেক বাঙালি মারা গেছে।' আবু মিয়াকে হঠাৎ ছুটাছুটি করতে দেখা গেল। চিৎকার করে তিনি বলছেন, 'তীর-ধনুক বানাতে হবে। হারামজাদাদের দেখামাত্র খতম করে দিতে হবে।' আরেক দিকে মার্চ পাস্টের নেতা সানাউল্লাহ ভাই বলছেন, 'লাঠি-ফালা-ছোরা যার যা আছে, তাই নিয়ে তৈরি হও সবাই। আজ রাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।'

জনসমাবেশটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। যেন ক্রোধের বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল সবার মাঝে। পূবের রাস্তায় একজনকে ঘিরে বিরাট দঙ্গল এগিয়ে আসছে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একজন আসছেন। তাকে ঘিরে অন্য সবাই কথা বলছে। যিনি আসছেন তার নাম আফতাব। তিনি বাঙালি মিলিটারী। চট্টগ্রামে ছিলেন, পালিয়েছেন। কয়েকদিন ধরে পায়ে হেঁটে হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে পাবনা পৌঁছেছেন। স্কুলের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায় বন্ধু সেলিমের বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। ধরাধরি করে সবাই তাকে নিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে পা নাকি ব্যথা হয়ে ফুলে গেছে। যাবার সময় তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বলে গেলেন, 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সবাই পাকিস্তানি ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছি।'

[লেখাটি লেখকের 'ঘাতকের পদতলে বসবাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

৪-এর পৃষ্ঠার পর : দাদাকে দেখে মায়া লাগত। বৃদ্ধ মানুষ, ছেলের জন্য হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন যায়গায় যাচ্ছেন। এখনকার প্রজন্ম হয়তো ঠিক বুঝতে পারবেনা- কী দুঃসহ সময় ছিল তখন। সবাইকে বাস থেকে বিভিন্ন চেকপোস্টে নামানো হচ্ছে। নারী, পুরুষদের আলাদা করা হচ্ছে। কলেমা পড়তে বলা হচ্ছে। আম্মার সামনেই একদিন বাস থেকে নামিয়ে একজন কলেমা ঠিকমত পড়তে পারেনি বলে সবার সামনেই গুলি করে মেরে ফেলল। আম্মা প্রতিদিন ফিরে এসে সারাদিনের অবহেলা ও বঞ্চনার গল্প করতেন। আমরা ভাইবোনেরা একে অন্যকে সান্তনা দিতাম, আর আশায় বুক বাঁধতাম- হয়ত একদিন আব্বার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে.....।

আমার দাদা বয়স্ক মানুষ। উনি ক্লান্ত। ঠিক হল, দাদা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন এবং বাড়ী থেকে চাল, ডাল এবং আনুষঙ্গিক তৈজসপত্র নিয়ে ফিরে আসবেন এবং আমার ছোট চাচা বাড়ী থেকে আসবেন। চাচার বয়স তখন ৩০, কিন্তু উনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন আম্মাকে নিয়ে বিভিন্ন যায়গায় যাবার। উনার অনেক ঝুঁকি ছিল, কিন্তু বড় ভাইয়ের জন্য উনি মরতেও রাজী। এই অবস্থায় আম্মা সিদ্ধান্ত নিলেন যে উনি নাটোরে আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাবেন চাচাকে সঙ্গে নিয়ে। এটি খুব সহজ সিদ্ধান্ত ছিলনা। ওখানে আমাদের টগর নানা অডিটর হিসাবে পোস্টেড ছিলেন। আব্বার এক সহকর্মী আবদুল্লাহ সাহেবও কর্মরত ছিলেন। ওখানে নানার বাড়িতে দুইএকদিন থেকে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে নাটোর কলেজে অবস্থিত আর্মি কাম্প-এ পিটিশন দেওয়া হয়। নাটোর থেকে একদিন ফিরে এসে আম্মা বললেন, 'ভালো খবর হচ্ছে, এই প্রথম একজন আর্মি অফিসার আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। নাটোরে ঠিক কোনখানে এখন আমার মনে নাই, আম্মা বলেছিলেন, যে উনি দূরে অপেক্ষা করছিলেন আমার চাচার সঙ্গে। সম্ভবত নাটোর কলেজে যেখানে আর্মি ক্যাম্প ছিল। অনেক দূর থেকে একজন অফিসার উনাদেরকে দেখে ডেকে পাঠালেন এবং আম্মাকে দেখে উনি বললেন যে, তুমি আমার মায়ের মত দেখতে। আম্মা উনাকে বললেন যে, 'আমার স্বামী নিখোঁজ এপ্রিল মাস থেকে। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী হাউসে এবং এরপর থেকে আমরা ওনার কোন খোঁজ জানি না। উনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন সেটাও জানি না।' উনি বললেন, আমার কাছে ছবি আর পুরো তথ্য রেখে যাও। আমি খোঁজ নিবো। তোমাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে হয়েছে। আমি অনেক দিন মাকে দেখি নি। আমার মা তোমার মত দেখতে। আমি চেষ্টা করব তোমার স্বামীর খোঁজ করতে। এই বলে পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে দিয়েছিলেন আসার খরচ হিসেবে।

যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে কয়েকদিন পরে নাটোরে গেলেন সেই মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এবং যাওয়ার পরে যখন আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কোন খোঁজ কি পাওয়া গেছে? মেজর সাহেব অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাও? আম্মা বলেছিলেন, 'উনি কি বেঁচে আছেন?' উত্তরে মেজর বলেছিলেন. 'বেঁচে না থাকলে দেখা করবে কিভাবে?' বলেন, এখানে দেখা করানো যাবে না।

উনি একটা গাড়িতে আম্মা এবং দাদাকে নাটোর শহরের বাইরে ফুলবাগান বা ঝাউবাগান, আমার ঠিক মনে নাই যেখানে আর্মি ক্যাম্প ছিল। এরকম কোন একটা যায়গায় যেটি শহর থেকে অনেক বাইরে, সেখানে নিয়ে যেতে বলেন।

আরেকটা ট্রাকে করে আমার বাবাকে নিয়ে আসা হলো। আম্মা চাচা অপেক্ষা করছেন। দূর থেকে আমার বাবাকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং আম্মার একসময় মনে হয়েছিল যে, ভুল করে অন্য একজনকে নিয়ে আসা হয়েছে। আম্মা আমাকে বলেছিলেন, লম্বা দাড়ি শীর্ণকায় এক মানুষ, ভালোমতো চোখে দেখেনা- আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। অনেকটা 'সবার উপরে' সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মত দেখতে। আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন, 'তুমি বেঁচে আছো? ছেলে-মেয়েরা কি বেঁচে আছে?' আম্মার চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে না খেয়ে নির্যাতিত হয়ে এই অবস্থা। আমি তো সেই সময় কাছে ছিলাম না, তবুও আম্মার বর্ণনা শুনে মনে হয়েছে- এই যে দেখা হওয়া সে এক হাসি কান্নার মুহূরত। খুশির ও বেদনার আনন্দে সবার চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রু। ঐখানে যে অবাঙালি হাবিলদার ছিল সে বাংলা জানত। ওকে পাঠানো হয়েছিল- খুব কাছ থেকে কি কথা হচ্ছিল সেসব শুনতে এবং রিপোর্ট করতে। আব্বা এটা বুঝতে পেরে আম্মাকে শুনিয়ে বলেছিলেন, এরা আমারকে ভালোভাবেই রেখেছে। বলেছিলেন, আমার ওচাখের অবস্থা খুব খারাপ। আমি ওষুধের কথাটা আমার স্ত্রীকে লিখে দিতে চাই, যেন আমি সুস্থ হতে পারি। হাবিলদার রাজি হলে সেখানে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেটের উল্টোদিকে সেই হাবিলদারের কলম দিয়ে আমার বাবা কাঁপা কাঁপা অক্ষরে আমাদের তিন লাইনের চিঠি লিখলেন, 'মুক্তা, মনজু, আনজু ও রনজু আমি বেঁচে আছি। তোমার মা বললেন, তোমরাও বেঁচে আছো। দোয়া করবে- আমি যেন ফিরে আসি এবং তোমাদের সঙ্গে আবার একসঙ্গে হতে পারি।

এর কিছুক্ষণ পরে ওরা আব্বাকে আবার বেঁধে নিয়ে চলে গেল। আম্মা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসলেন রাজশাহী। আমাদের কাছে গল্প করলেন, আমরা আনন্দের কান্না কাঁদলাম সব ভাইবোন মিলে একসঙ্গে।

তখন ১৯৭১ সালে, আমরা যারা যুবক ছিলাম, আমরা যারা লেখাপড়া করতাম সে সময়- আমাদের বের হওয়া কঠিন ছিল। আমরা খালু খালামা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কোনো বুদ্ধি তেমন পাইনি। তাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও তেমন ছিল না। আমার দুই মামা ইন্ডিয়া চলে গেছেন। বড় মামা পাবনায়। আমরা বসে ঠিক করতাম- যে কয়টা টাকা রোজগার করছি- সেই টাকা দিয়ে কিভাবে আমরা দিন চালাবো। আমার দাদা এই বৃদ্ধ মানুষ খুব কষ্ট করেছেন ছেলের জন্য, বউয়ের জন্য। নাতি-নাতনির জন্য নিদারুণ পরিশ্রম করেছেন। ছোট চাচা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আম্মাকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। একদিন মারাই যাচ্ছিলেন। দাদার জন্য ভাত নিয়ে চাচা আর আমার খালাতো ভাই মাসুদ আসার পথে সিওবি মোড়ে আর্মি থামালো। জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাও? উত্তরে সন্তুষ্ট নয়। একজনকে বলে, এদের দুজনকে গুলি করো। দূরে আমাদের গ্রামের একজন সিপাই ভাগ্যক্রমে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এগিয়ে এসে কাকুতি মিনতি করে বলে, 'উনি আমাদের গ্রামের, সম্মানিত লোক। কি ভেবে ওরা মত পরিবর্তন করে ছেড়ে দিল। উনারা নুতন জীবন পেলেন।'

এরকম কত কাহিনী। এই প্রজন্মের অনেকের কাছেই কল্পকাহিনী মনে হতে পারে। উনসত্তরের দিকে আমার এক বন্ধু আর্মির ক্যাপ্টেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটিতে এসে রাজশাহীতে বেড়াতে এসে কয়েকদিন ছিল। সেসময় ইপিআরের ক্যাপ্টেন ইসাহাকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সে পাঞ্জাবের মানুষ, কিন্তু একটু অন্যদের থেকে আলাদা। আমার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। আমি ওর ওখানে যেতাম, ও আমাদের বাসায় আসতো। আব্বাকে খুব সম্মান করত। বলতো, 'আমার পরিবারকে মিস করি, তোমার এখানে এলে আমার ভালো লাগে।' আমার লাভ হল যে, এই ফাঁকে আমার ইংরাজি বলাটা সড়গড় হলো। একবার ১৯৭০ সালে আব্বা-আম্মাসহ আমাদের সবাইকে নিয়ে আর্মির গাড়িতে নাটোর রাজবাড়ী দেখাতে নিয়ে গেলো। সেটি খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা ছিল। সে রাজনীতি বা পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের যে বিভেদ- সেগুলি নিয়ে কোন সময় কথা বলতোনা। এমনকি মার্চের প্রথম সপ্তাহেও।

ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল একজনের মাধ্যমে, কিন্তু আসার সুযোগ পাচ্ছিলনা। এর মধ্যে ও মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছে। খবর পেয়েছে আব্বা বন্দী। একদিন এক উচ্চঈঅচ-এর ঝচ কে নিয়ে বাসায় এল। দুজনে অনেক্ষণ আলাপ করল- কিভাবে আব্বাকে মুক্ত করা যায়। খুব বিষণ্ন। আমার মনে আছে, বারবার সেই পুলিশ অফিসারকে মেজর ইসাহাক উর্দুতে বলছে, 'আলতামাস সাহাব ইতনা শরিফ আদমি। ইতনা শরিফ আদমি, হাম কভি নাহি দেখা।' ওর এত মন খারাপ যে, আমি থাকতে এরকম হল? আর আমি কিছু কর?তে পারছিনা! লজ্জায় আমার দিকে ভালোমত তাকাতে পারছে না।

উনারা কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন। এর পরে মেজর ইসাহাকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি কয় মাস। মনে হয় অন্য কোথাও বদলী হয়ে চলে গিয়েছিল। দেখা আর একবার হল ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে। আমি আমদের পাড়ার বড় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। পাকিস্তান আর্মির কনভয় নবাবগঞ্জের দিক থেকে সম্ভবত নাটোরের দিকে যাচ্ছে স্যারেন্ডার করতে। মেজর ইসাহাক এক জীপে বসা। আমাকে দেখে হাত তুলে সালাম দিল, হাত নাড়ল। জীপ এগিয়ে চলল।

আম্মা নাটোর থেকে ফিরে আসার পরে আর নাটোরের ওই মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। আব্বা বন্দী আছেন, আমরা আমাদের আত্মীয়- এর মাধ্যমে জেলখানায় চাকরি করেন- এমন একজন কর্মচারির সঙ্গে যোগাযোগ হল। উনি আমাদের বললেন, আমি আপনাকে খবরা-খবর এনে দেবো, এবং প্রয়োজনীয় জিনিস যদি লাগে, সেগুলি আমি ওনাকে দিয়ে আসব। আব্বার চোখের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। উনার জন্য কিছু ওষুধ, মাথায় দেওয়ার জন্য একটা বালিশ আর দু-একটা কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়েছিল। ছোট ছোট কাগজে আমাদেরকে লিখে দিতেন, উপদেশ দিতেন। এটি আমাদের কাছে ছিল বিশাল মূল্যবান। উনি বেঁচে আছেন- এটা তার প্রমাণ। আমরা জানতাম না কিভাবে ওনাকে মুক্ত করবো। কোন পথ খুঁজে পাইনা। আব্বা কি আর ফিরে আসবেন না? এই চিন্তায় আমাদের রাতের ঘুম হয়না। অনেকদিন আগে পড়া কবিতার কথা মনে হয়, 'তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি। তোমার অপেক্ষায় কেটে গেল দীর্ঘ মাস। কত দীর্ঘশ্বাস পড়ল ক্লান্তশরীরে।'

সম্ভবত জুন মাসের শেষের দিকে অথবা জুলাইয়ের প্রথম দিকে আম্মা দেখেছিলেন, আর্মি সেপাইদের সাঁতার শেখানো হচ্ছে নাটোরের কাছে এক পুকুরে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি হিসাবে। ওরা তো সাঁতার জানে না তাই পানিতে খাবি খাচ্ছে। তখন মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধেছে। পাকিস্তানী আর্মিরা বিভিন্ন জায়গায় মার খাচ্ছে। আমি রেডিওতে কাজ করে যাচ্ছি, এই সময় হঠাৎ দেখি যে রেডিওতে অনেক আর্মির লোকদের আনাগোনা। এক সময়ে দেখলাম, লাল টুপি পরা সেনাবাহিনীর লোকজন এসে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে। একে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, জানলাম ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার থেকে এই অঞ্চলের প্রধান মেজর জেনারেল পদবীর একজন সেনা কর্মকর্তা এখানে আসবেন।

নানাভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার পরে আমাদের তারিখ জানানো হলো। নির্দিষ্ট দিনে উনি আসবেন। ভিআইপি স্টুডিওতে আমরা সবাই বসে থাকবো। উনি কক্ষে প্রবেশ করলে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সালাম দিব, এবং উনি আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিবেন। আব্বা বন্দী অবস্থায় বেঁচে আছেন এটুকু জানি, কিন্তু উনি কি আদৌ ছাড়া পাবেন, না ওরা উনাকে মেরে ফেলবে- এইসব চিন্তায় আমি তখন দিশাহারা। মৃত্যু তখন খুব সহজ ব্যাপার। এই বিষয়টি এখনকার প্রজন্ম ঠিক বুঝতে পারবেনা।

এই ভয়ানক অবস্থা। আমি তখন মরিয়া। এই সময়ে আমি একদিন সাইফুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি কিছু বলতে চাও?' কেমন করে সাহস পেলাম আমি জানি না। আমি ওনাকে বললাম, 'স্যার আপনার অনেক ক্ষমতা। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আব্বাকে মুক্ত করতে পারেন। আপনি কি জেনারেলের কাছে সুপারিশ করবেন এই বলে যে- তার ছেলে এখানে কাজ করে। আমি ওর বাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। ওর বাবাকে বিনা অপরাধে আটক করা হয়েছে এবং পরিবার উনার আর কোন খবর জানেনা। আপনার কাছে আমার মাধ্যমে ফরিয়াদ করেছে যেন উনাকে মুক্ত করা হয়।'

উনি আমার কথা শুনলেন। অনেক্ষণ চিন্তা করে আমাকে বললেন, 'দেখো এইসব জেনারেলদের।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

[গুয়াংজুঁর ক্যান্টন টাওয়ার চীনের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। লাগোয়া আছে নদী। দুইয়ে মিলে রোমাঞ্চকর জগৎ। রয়েছে সারাদিন ধরে দেখার মত মনোমুগ্ধকর স্থাপনা। সন্ধ্যেয় দেখা মেলে কল্পনাতীত স্বর্গীয় দৃশ্য। অনেক রাত অবধি থাকে মানুষের জমজমাট কোলাহল। দিনের আলো কাটতেই হরেক রকম আলোকমালায় দৃশ্যমান হতে থাকে সুবৃহৎ টাওয়ার। ধীর লয়ে চলে যায় নাচের জগতে। রঙের নহর ছড়াতে থাকে চারদিক। প্রকৃতি জুড়ে দিতে থাকে ঝলকানি। টাওয়ারের রঙ বদলাতে থাকে। চারদিকের বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলোও ঘটাতে থাকে বাহারি রঙের বিচ্ছুরণ। আলোক রশ্মির ছড়াছড়ি চলতে থাকে অবিরাম। সব মিলিয়ে এলাকাটি হয়ে ওঠে বর্ণিল। এরসঙ্গে যুক্ত থাকে প্রাণ জুড়ানো চীনা মিউজিক। ফাঁকা এলাকা বলে বয়ে যায় প্রবল বেগের স্নিগ্ধ বাতাস। জায়গাটি এভাবেই পরিণত হয় স্বপ্নিল ভূস্বর্গে। বেড়াতে বা ভ্রমণ করতে আসা শত-সহস্র নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ এর মধ্যদিয়ে চলে যান আকাশে ভেসে চলার মত অন্য এক জগতে, যেখানে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। ঠিক এরকম দৃশ্যের ভেতর আরেক দৃশ্য হয়ে ওঠে বয়ে চলা নদী। এর ঢেউ খেলানো পানিকে তখন আর পানি মনে হয় না, মনে হয় যেন হাজারো রঙের উত্তাল নৃত্য। লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো, সবুজসহ অসংখ্য রঙের খেলায় মেতে ওঠে নদী। তার ভেতর দিয়ে চলাচল করে আলোকমালায় সজ্জিত স্টিমার আর নৌকা। এই স্বপ্নজগৎ ভ্রমণ নিয়েই এ প্রতিবেদন।- লেখক]

গুয়াংজুঁর ক্যান্টন নগরী

নদী-টাওয়ারের স্বপ্নজগৎ

ইয়াসমিন হোসেন

সময়টা ছিল দুপুর। মাত্র ক'মাস আগের কথা। গুয়াংজুঁর সানিয়ানলি। হোটেল থেকে মেট্রো স্টেশন। তারপর ট্রেন যাত্রা। কয়েক দফা লাইন পাল্টানো, তারপর শেষ মেট্রো। এই মেট্রো নামিয়ে দিয়েছিল ক্যান্টন টাওয়ারের নিচে মাটির তলায়। তারপর সেখান থেকে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সুবিশাল ভবন। ভবনের ছাদেই দানবতুল্য টাওয়ার।

যে ভবন দিয়ে এগুচ্ছিলাম, সেটা অত্যাধুনিক শপিং মল। অসংখ্য স্টল আর ঝলমলে আলো চারপাশটাকে রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে রেখেছিল। নানা অঙ্কন চিত্রে সাজানো ছাদ এবং দেওয়ালগুলোর লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসছিল চাইনিজ মিউজিক। দুপুর বেলায়ই নেমে এসেছিল রঙিন রাত। কারণ বাইরের আলো প্রবেশের সুযোগ ছিল না। খানিকটা পথ পেরিয়ে গেলেই বেরুনোর পথ। সেই পথ পার হলেই ভিন্ন জগৎ। অকস্মাৎ উজ্জ্বল ঝকঝকে দিন। চারপাশ জুড়ে রং বে রংয়ের ভবন। আরও খানিকটা হাঁটা। তারপর চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুয়াংজুঁর বিখ্যাত ক্যান্টন টাওয়ার। এতোটাই উঁচু যে, মাথাকে পেছন দিকে পুরো ৯০ ডিগ্রি নামিয়ে ফেলতে হয়। দিনের বেলায় টাওয়ারকে সূর্য্যের আলোয় অন্যরকম দেখায়। সাদা-হলুদ এবং খয়েরি রংয়ের এ দানব একেবারে আকাশমুখি। ভবনের ছাদে এর দাঁড়িয়ে থাকা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সেখানেও আছে নানান আকর্ষণীয় স্থাপনা। ছাদটা নেহায়েত ছোটখাটো নয়। বড় কোন স্টেডিয়ামের সমান। যেখানে আছে সময় কাটানোর সবরকম সুযোগ এবং সুবিধা। আছে বসার জায়গা, রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দূরের দৃশ্য ধারণের ব্যবস্থা। আছে রেস্টুরেন্ট আর অ্যাকুরিয়ামের মত পানির পুকুরে জলকেলির আয়োজন। ঠিক একই রকম ব্যবস্থা আছে টায় দাঁড়িয়ে থাকা টাওয়ারের শরীর জুড়ে। একতলা, দোতলা, তিনতলা- এভাবে আছে অনেকগুলো তলা।

ক্যান্টন টাওয়াটা আসলে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। একইসঙ্গে টেলিভিশন টাওয়ারও। অ্যান্টেনাসহ এর উচ্চতা ৬শ মিটার বা ১৯৬৮ ফুট। স্থায়ী কাঠামো দাঁড়িয়ে ৪৫০ মিটার জুড়ে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার। টাওয়ারের বিভিন্ন অংশ বা তলায় রয়েছে কফিশপ, রেস্তোরা, পর্যবেক্ষণ ডেস্ক, থ্রিল রাইডসহ অনেককিছু। পর্যটকদের সব চাহিদাকেই পূরণ করে ক্যান্টন টাওয়ার।

ভ্রমণের সময়টা ছিল গরম কাল। শীত তখনও আসেনি। টাওয়ার চত্তরে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণা ঝড়ের মত একটানা বয়ে যাওয়া মধুর বাতাস ছিল গোটা এলাকা জুড়ে। লাগোয়া অসাধারণ নদী। বৈচিত্রের আরেকটা রূপ। একেবারে স্বচ্ছ নদীতে ঢেউয়ের উল্লম্ফন। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পানির নাচন অভিভূত করে রাখে। তার মধ্যেই ছোট বড় রঙিন নৌকা এবং স্টিমারের আনাগোনা। অনেক পর্যটকই এসব নৌকা-স্টিমারে চড়ে ভ্রমণের ষোলকলা পূর্ণ করছিলেন।

নদী দর্শন আর স্মৃতি ধারণের জন্য বীচের মত দুই পাড়ে আছে চমৎকার রেলিং। তাতে হেলান দিয়ে অপার সৌন্দর্য শুধু দু'চোখ ভরে চারদিকটা দেখাই শুধু যায় না, ক্যামেরায়ও ধারণ করা যায়। নদীটা অনেক কিছু ভাবায়, মনকে জন্মভূমির ঠিকানায় নিয়ে যায়।

নদী আর টাওয়ারকে ভাল করে দেখার জন্য আছে চমৎকার ব্যবস্থা। আছে নদীর উপর ‘হাইজিং’ নামের একটা অসাধারণ ব্রিজ, যাকে মনে হয় একেবারে স্বর্গের দোলনা। এমন সব ধাতুতে ব্রিজটি করা, যা আগে কখনই দেখিনি। ব্রিজ জুড়ে বসার ব্যবস্থা, সময় কাটনোর বন্দোবস্ত, চোখ ধাঁধানো রঙিন ফুলের সমাহার, লাইটিং, মিউজিক- সবমিলিয়ে সন্ধ্যের পর জায়গাটা রূপ নেয় কল্পনার স্বর্গে। সব ঝকঝকে তকতকে। কোথাও একফোটা নোংরা নেই। নানা বয়সী তরুণ-তরুণি-কিশোর-কিশোরি-বয়স্ক মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে এর উপর ঘুরছিলেন। ছবি ধারণ করছিলেন। রাতটা সত্যিই স্বপ্নিল, রঙিন আর স্বপ্ন তুল্য হয়েছিল। এতে সায় মেলাতে ক্যান্টন টাওয়ার দিগন্ত জুড়ে ঘটাচ্ছিল আলোর বিচ্ছুরণ। ব্রিজটি যেন ভাসছিল স্বর্গ হয়ে। আর নদী ছড়াচ্ছিল আরেক রূপ। সার্থক জনম এই স্বপ্ন জগতে।

সমাপণী কথা : ক্যান্টন নগরী ঘুরে নিজের দেশের, নিজের জন্মভূমির কথা মনে হচ্ছিল। প্রশ্ন জাগছিল একটা নদী আর একটা টাওয়ারকে কেন্দ্র করে চীনারা যদি স্বর্গভূমি বা স্বপ্নজগৎ তৈরি করতে পারে- তাহলে আমরা কেন পারি না? আমাদের কি নদী নেই, স্থাপনা নেই, সম্পদ নেই? কিংবা নেই সামর্থ?

আমাদের এই পাবনায় ইছামতি নদী আছে, পাকশীতে পদ্মা আছে, সুজানগর-বেড়ায় পদ্মা-যমুনা দুই-ই আছে। আছে মাতৃভূমির আদি-অকৃত্তিম প্রাণ-প্রকৃতি। সবই আছে। নেই কেবল চিন্তা, ইচ্ছা আর স্বপ্ন। এই ক'টি জিনিস থাকলে ইছামতির দুই তীর মিলে গড়ে উঠতে পারতো স্বর্গীয় ক্যান্টন নগরী। পদ্মা-যমুনার বিভিন্ন অংশ হতে পারতো এক-একটি বর্ণিল কেন্দ্র।

মধুময় সরিষা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার সরিষা ক্ষেত থেকে এবার সাড়ে ৪ কোটি টাকার মধু আহরিত হয়েছে। মৌচাষিরা মৌবক্স দিয়ে এই মধু আহরণ করেছেন। কৃষি বিভাগ এবারের জন্য ঠিক এই পরিমাণ মধু আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরিষার জমিতে মধু সংগ্রহ করা হয়। ক্ষেতে সরিষায় ফুল ফোটার পর থেকেই মৌচাষিরা মৌবক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ শুরু করেন। প্রতিবারের মত এবারও চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া এবং জেলার আরও কয়েকটি উপজেলায় সরিষার আবাদ বেশি হয়। সূত্র জানায়, পাবনার ৯ উপজেলা মিলিয়ে মধু আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০ মেট্রিক টন, যার বাজারদর প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা। মধু আহরণের জন্য কৃষি বিভাগ থেকে মৌচাষীদেরকে মৌবক্স দেওয়া হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতেও প্রয়োজনীয় সব পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া হয়। এর ফলে এবারও মধু আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী, আবাদি জমি কমতে থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই সরিষার আবাদ বেড়েছে। গত বছর জেলায় ৪৪ হাজার ৮৯০ হেক্টর ও এবার ৪৫ হাজার ৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়। এসব জমির পাশেই সদর উপজেলায় ৭৮৮, আটঘরিয়ায় ২০০, ঈশ্বরদীতে ৪৫০, চাটমোহরে ৩ হাজার ২৫০, ভাঙ্গুড়ায় ৬ হাজার ১২০, ফরিদপুরে ১ হাজার ৭৫, বেড়ায় ২০০ ও সাঁথিয়ায় ১০০টিসহ মোট ১২ হাজার ১৮৩টি মৌবক্স স্থাপন করে মধু আহরণ করা হয়। গত বছর মৌবক্সের সংখ্যা ছিল ৮ হাজারের মতো। এ বছর ২২৬ জন মৌচাষি মধু চাষের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, তেলের চাহিদা ও দাম বাড়ায় পাবনায় প্রতি বছরই বাড়ছে সরিষা চাষ। সরিষা একদিকে যেমন তেলের চাহিদা মেটায়, তেমন মধু আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জমির পাশে মৌবক্স বসিয়ে কেবল মধু সংগ্রহের বিষয়টিই এখানে মুখ্য নয়। এর মধ্যদিয়ে পরাগায়ন বৃদ্ধিতে বাড়ে সরিষার ফলন। এতে লাভবান হন সরিষা চাষিরা। সূত্র জানায়, বাজারে সরিষা ফুলের খাঁটি মধুর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এবার ভালো দামে লাভবান হচ্ছেন মধু চাষিরা। অনেকে খাঁটি মধুর আশায় জমির পাশে সারি সারি বসানো মৌবক্স থেকেই মধু সংগ্রহ করছেন। আবার ড্রামে করেও বিভিন্ন জায়গায় মধু পাঠানো হচ্ছে। এ মধু বিক্রি করে প্রতি কেজি ৪০০ টাকা গড় দর হিসেবে প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা আয় হবে।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

৫-এর পৃষ্ঠার পর : মেজাজ মর্জি কোন ঠিক থাকেনা। আমি তো তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি না, তবে এটুকু বলতে পারি- যদি দেখি জেনারেল সাহেবের মেজাজ অনুকূলে, আমি এই ব্যাপারটা ওনার কাছে তুলে ধরব।' এই কথা বলে শেষ করলেন। আমি ভাবলাম এটি কথার কথা আমাকে একটা সান্তনা দিলেন। কারণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একজন জেনারেলকে এইসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আলাপ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক সাহসের দরকার, আর আমার জন্য উনি এই বাড়তি ঝুঁকি কেনই-বা নিবেন? যাই হোক আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে আমার ঠিক মনে নেই, নির্দিষ্ট দিনে আমরা অপেক্ষা করছি। বিশাল বপুর মেজর জেনারেল নজর হুসেন শাহ, একজন আর্মি অফিসার, আর রিজিওনাল ডাইরেক্টর- এরা তিনজন কক্ষে প্রবেশ করলেন। যাই হোক পরে জেনেছিলাম, সেই ভদ্রলোক জেনারেলের এডিসি, একজন ক্যাপ্টেন। একটা পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ দেয়ালে টাঙানো হল। জেনারেল ভাষণ শুরু করলেন এবং বললেন, মুক্তিযুদ্ধ কি? কোরিয়ায় উনার নিজের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার গল্প করলেন। এরপরে উনি বললেন, 'যেন হিন্দুদের হাতে না চলে যায় এই দেশ, সেই লক্ষ্যে আমরা যুদ্ধ করছি। এই গেরিলারা চিড়া মুড়ি খেয়ে কি যুদ্ধ করবে? আমরা সামনের ঈদ ইনশাআল্লাহ কলকাতায় করব।' বেশিরভাগই ছিল উর্দুতে, মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছিলেন। একসময় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কারো যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে আমাকে আপনারা নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন।' একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমরা এখানে কাজ করছি সরকারের, কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজন গ্রামে বাস করে। ওখানে মুক্তি বাহিনী কোন ব্রিজ উড়িয়ে দেবার পরে আপনার আর্মি এসে সব ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।' জেনারেল হটাৎ করেই খুব ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'আমাদের আর্মি কখনই এ কাজ করেনা। কিন্তু তোমাদের দায়িত্ব মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেওয়া।' আমরা সবাই সেই ভদ্রলোকের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। উনি বক্তৃতা শেষ করে চলে গেলেন উপরতলায়, আরডি সাহেবের অফিস কামরায় আমি ভাবলাম, জেনারেলের মেজাজ খারাপ। আরডি সাহেব হয়তো আর আমার ব্যাপারটা তোলার সাহস পাবেন না। আমরা যে যার মত কাজ করছি। চুপচাপ বসে আছি সবাই। ভয়ে আছি যদি পান থেকে চুন খসলে কোন বিপদ হয়। একসময় দেখি ক্যাপ্টেন নেমে আসছে। আমি দূরে ছিলাম। কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আশরাফ আহমেদ কে? আমি কাছে যেতেই উনি আমাকে ইংরেজিতে বললেন, 'আমার নাম ক্যাপ্টেন আশিফ। তোমাদের ডাইরেক্টর আমাদের জেনারেল সাহেবের কাছে একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। আমাকে জেনারেল সাহেব বলেছেন এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। আমি একটা ঘরে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' তাড়াতাড়ি একটা ঘর খালি করার ব্যবস্থা হল। রেডিও স্টেশনের সবাই চুপচাপ। ভাবছে হয়ত আমি কোন অপরাধ করেছি, সে কারণে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমাকে উনি বললেন, 'তুমি কি করো? আমি জানালাম আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।' বললেন, তোমার বাবার কথা বলা হয়েছে। কি হয়েছিল?' আমি বললাম, 'আমার বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। উনি দিনাজপুরে চাকরিরত ছিলেন এবং যুদ্ধ শুরু হলে উনি রাজশাহী চলে আসেন এবং চাকরিতে যোগ দেন। আমাদের পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সংগে সম্পৃক্ত, হয়তো সেই কারণে কেউ শত্রুতা করে আর্মিকে খবর দিয়েছে। কিন্তু আমার আব্বা কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। উনি সরকারি চাকরি করে গেছেন সারাজীবন।' আমাকে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি ভাষায় কথা বলবো?' আমি বললাম, 'আমি উর্দু ভালো বলতে পারিনা, তবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারব।' কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনার কোন ছবি আছে তোমার সাথে?' আমি বললাম, 'আমার কাছে তো নাই, বাসায় একটা-দুটো থাকতে পারে।' উনি আমাকে হঠাৎ করে বললেন, 'আমি তোমার বাসায় যেতে চাই।'

আমার মনে হয়, আমাদের পারিবারিক অবস্থার কথা জানতে চাচ্ছেন ভালোভাবে। আর্মির ৩/৪ টা গাড়ি রেডি করা হলো। রওয়ানা হলাম। পাড়ার অর্ধেক লোক দূরে পালিয়ে গেল। বাসায় কেউ ছিল না। ওই দিন কোন কারণে আম্মা ভাই-বোনদের নিয়ে খালার বাসায় ছিলেন। আমরা বাইরের ঘরে বসলাম। আমি এলবাম থেকে একটা ছবি বের করে দেখালাম। তারপর তিনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমাদের পারিবারিক আবহের কথা, পারিবারিক অবস্থানের কথা, আমি কি করছি, আমি ভবিষ্যতে কি হতে চাই? আমি উত্তরে বলেছিলাম, ভবিষ্যতে কি হতে চাই সেটা তো পরের কথা। আমার বাবা যদি না ফিরে আসে, তাহলে আমাকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। হয়তোবা আমি আর পড়াশোনা শেষ করতে পারবো না। কেরানি হয়ে সংসার চালাতে হবে। আব্বা বেঁচে আছেন এবং আম্মার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছে- সে কথা আমি উনাকে বলিনি। ক্যাপ্টেন আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, উনি আমার কথা বিশ্বাস করেছিলেন। আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম এসব কথা বলার সময়। দেখা গেলো আমরা দুজন একই বয়সের। ১৯৬৮ তে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে উনি আর্মিতে গিয়েছিলেন, আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলাম।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ করে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমাকে ইংরেজিতে বলছিলেন, 'এভ্রিথিং উইল বি অলরাইট, ইনশাআল্লাহ।' আমাকে বললেন, 'আমি গিয়ে জেনারেল সাহেবের কাছে- তোমার বাবা যাতে মুক্তি পান, সে ব্যাপারে সুপারিশ করব। কখন করতে পারবো আমি জানি না, উনি ব্যস্ত মানুষ। আমি সুযোগ করে তার সঙ্গে এটা নিয়ে আলাপ করব। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।'

আমরা রেডিওতে ফিরে আসলাম। ক্যাপ্টেন আসিফ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন। আধ ঘণ্টা পরে সবাই একসঙ্গে নেমে রওনা হলেন নাটোরের পথে। এরপরে সবাই আমাকে চেপে ধরল, 'ভাই আপনি বেঁচে আছেন? আমরা তো ভাবলাম যে, আপনি বোধ হয় শেষ। কি কথা হলো?' আমি বললাম, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তার কিছু তথ্য জানার ছিল আব্বার বিষয়ে, সেগুলি নিয়ে প্রশ্ন করলো।'

যাই হোক, সাইফুল্লাহ সাহেব আমাদের জন্য তো এই কাজটুকু করলেন। তার কি দরকার ছিল আমার মত একটা নগণ্য মানুষের জন্য ঝুঁকি নেবার! এরপরে আমি কাজ করছি আর ভাবছি ক্যাপ্টেনের কথাগুলি। ভাবলাম, এদের কথার তো কোন ঠিক নাই, হয়তো ভুলেই গেছে। আমি রেডিওতে কাজ করছিলাম। সপ্তাহ খানেক পরে, বেলা এগারোটার দিকে ফোন এলো, আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ক্যাপ্টেন আসিফ। আমি ফোন ধরলাম। উনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমার বাবার খবর নিয়েছি। তোমার বাবা বেঁচে আছেন, নাটোরে আছেন। আমি জেনারেল সাহেবের সঙ্গে কথা বলব, যাতে উনি মুক্তি পান। আমি তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল।' [যাই হোক- এরপরে ক্যাপ্টেন আসিফের সঙ্গে আমার আর কোনদিন কথা হয়নি। আমি তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি, তাকে অনেক খুঁজেছি ফেসবুকে দেখেছি। কিন্তু আমি কোন খবর নিতে পারিনি। বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন জানি না।]

এর মধ্যে আমাদের জীবন চলছে। নাটোরের জেলখানায় চাকরিরত সেই ভদ্রলোকের মাধ্যমে আব্বা ছোট ছোট চিরকুট পাঠাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে কিভাবে এসেছিল- এটা আমার ঠিক মনে নাই। ৫০ বছর আগের কথা। স্মৃতি অনেক সময় সাড়া দিচ্ছে না। অনেক কিছুই খবর পাচ্ছিলাম। এটুকু খবর পেলাম, আব্বার শারীরিক উন্নতি হয়েছে। যে ওষুধগুলো পাঠানো হয়েছিল, তাতে চোখের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তিনি আদৌ ছাড়া পাবেন কিনা- সে খবর তো আমাদের কেউ বলতে পারছে না। আমরা আশায় দিন গুনছি, আর স্বপ্ন দেখছি নীরেন চক্রবর্তীর কবিতার মত-

'অন্ধকারের বুকেও স্বপ্ন লুকিয়ে রাখি
নৈশ ভয়ের ভিত্তি খুঁড়ে। ধ্বস্ত বাড়ির
বিশাল কামরা যখন খোলে,
তখন আমরা স্বপ্ন আঁকি,
তার ভিতরেও স্বপ্ন আঁকি।'

মুক্তিযুদ্ধ শেষ পর্ব : মাঝে মাঝে রেডিওর খবরে বলা হয় যে, কিছু মানুষকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগেও এরকম ঘোষণা শুনেছি, কিন্তু আমাদের পরিচিত কাউকে ছাড়া পেতে দেখিনি।

সেদিন খুব ভোরে রেডিওর প্রথম ট্রান্সমিশন শুরু হয়। আমার ডিউটি ছিল। ওখানে খবরে শুনলাম যে, প্রেসিডেন্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। কিছু বন্দীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি বাসায় এসেছিলাম কোন একটা কাজে। আম্মা খবরটি শুনেছেন। আমাকে বললেন, 'জানো আজকে অনেককে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তোমার আব্বা যদি ছাড়া পেত, কত না ভালো হতো।' আমি বললাম, 'আম্মা এরকম ঘোষণা এর আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কাউকে ছাড়া হয়নি।'

আমি আবার রেডিওতে ফিরে গেলাম। কাজ করে ফিরে আসলাম। মনে আছে, ১০ অক্টোবর সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই বাসায়। এমন সময় আমার খালাতো ভাই মারজুক ও সিরাজুল ভাই আমাদের বাসায় এলেন সাইকেল নিয়ে। বললেন, 'খালাম্মা আপনি আমাদের বাসায় চলেন। একজন আর্মি অফিসার এসেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় খালুর ব্যাপারে। আপনি সঙ্গে সবাইকে নিয়ে চলেন আমাদের ওখানে।' আম্মার মনে বিভ্রান্তি, কেন আমার বোন আনজুকে নিয়ে যেতে হবে? আমরা তো সবসময় ওকে নিয়ে চিন্তা করি- যেন আর্মিরা বুঝতে না পারে এ বাড়িতে এই বয়েসের মেয়ে আছে। আমিও রাজী না। আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ওরা বলল, 'খালু ফিরে এসেছেন।' ওরা আম্মাকে হটাৎ করে বলতে চাচ্ছেনা। আমার কি অনুভূতি হচ্ছিল- সেটা আমি ঠিক বোঝাতে পারবোনা। মনের মধ্যে বাজনা বাজছে। চিৎকার করে আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে। খুশীতে কাঁদতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কাউকে বলতে পারছিনা।

রিকশায় করে কাদিরগঞ্জের পথে আম্মাকে বললাম, 'আম্মা এমন যদি হয় যে যেয়ে দেখি আব্বা ফিরে এসেছেন।' আম্মা বললেন, 'আমাদের কি সেই ভাগ্য হবে?' কাদিরগঞ্জে খালার বাসায় পৌঁছে দেখি- লোকে লোকারণ্য। পাড়া ভেঙে সবাই এসেছে। বারান্দায় আলো আঁধারে দাঁড়িয়ে আছেন লম্বা দাড়িওয়ালা এক অচেনা মানুষ। কাছে যেতেই দেখি আব্বা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদেরকে দেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমরা এসেছো?' আম্মা আব্বাকে দেখে ইটের উপর পড়ে মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আমরা ভাইবোনেরা আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না তখনকার অনুভূতি।

যাই হোক, সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের নানা। উনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে শুকরানা নামাজ পড়তে হবে। তোমরা সবাই ওজু করে এসো।' নানা ইমামতি করলেন। আমরা পুরুষেরা সবাই শোকরানা নামাজ পড়লাম। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আব্বাকে আমরা সারাজীবন দেখেছি একজন স্বল্পভাষী মানুষ হিসেবে, কিন্তু সেই রাতে উনাকে কথায় পেয়েছিল। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। বলছেন, 'এ জালিমরা শেষ হয়ে যাবে। এদের পতন খুব শিগগির হবে। তোমরা দেখে নিও।' একই কথা বারবার বলছেন। আমরা ওনাকে থামাতে পারছিনা। অনেক রাত হয়ে গেলো। আমরা আমাদের কাজিহাটার বাসায় ফিরে এলাম। অনেক রাত পর্যন্ত উনি বার বার বলছেন, 'এদের পরিণতি খুব খারাপ হবে। এরা মানুষ নয়।' পরদিন দেখি, শরীর খারাপ। এরপর দিন থেকে দেখি, উনি আর কথা বলছেন না। একদম চুপ, কিছুই বলছেন না। সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। এক কাপড়ে এই কয়েকটা মাস।

আব্বাকে যখন নাটোরের কারাগার থেকে ছাড়া হয়, তখন উনাকে একটা কাগজ দেয়া হয়। সেখানে লেখা ছিল, 'এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত উনি বন্দী ছিলেন। এটাকে ছুটি হিসেবে ধরে নিয়ে আবার উনি কাজে যোগ দিতে পারবেন।' আর বাড়ি ফেরার জন্য দশটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

কাগজটি দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে উনি ছুটির আবেদন করলেন। উনি লিখলেন, 'শরীর খুব খারাপ। কাজে যাওয়ার মত অবস্থা নাই।' আব্বার কাছে শুনেছিলাম, সেদিন রাজশাহী শহরের মোট চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারা তারা- সেটা আমি জানিনা। হঠাৎ করে খবর পেলাম, এ চারজনের দুজনকে আলবদর বাহিনীর লোকেরা এসে ধরে নিয়ে গেছে। তারা আর ফিরে আসেনি। একথা শুনে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আব্বাকে পাড়ার আর এক বাড়িতে লুকিয়ে রাখলাম।

এভাবে যুদ্ধ শেষের দিকে ভারতীয় ছত্রী বাহিনীর প্লেন দেখছি আকাশে উড়ছে। চারিদিকে শুনছি, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনী যৌথ কমান্ডের সঙ্গে। পাকিস্তান বাহিনী পিছু হটছে। ভারতীয় প্লেন থেকে কিছু হ্যান্ড বিল ছাড়া হল। সেখানে লেখা আছে উর্দুতে, 'হাতিয়ার ডাল দো।' এটি একটি আদেশ- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং অঙ্গ সংগঠনের সবার উদ্দেশ্যে। একটি বাণী সেখানে লেখা আছে, 'তোমাদেরকে চারিদিক থেকে আমরা ঘিরে ফেলেছি। তোমরা যুদ্ধ শেষ করো। অস্ত্র সমর্পণ কর। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি- তোমার পরিবারের কাছে তোমাদেরকে আমরা ফিরিয়ে দেবো।'

১৬ তারিখে দেশ স্বাধীন হলো। রমনা রেসকোর্সে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হল। কিন্তু রাজশাহীতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আর্মি ফিরে আসার কারণে সম্ভবত ১৮ ডিসেম্বের রাজশাহীতে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা বড় রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম পাকিস্তান আর্মির কনভয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিক থেকে আসছে। দেখলাম এক জিপে মেজর ইশাহাক বসে আছেন। আব্বাকে দেখে হাত তুলে সালাম দিলেন।

এরপরে স্বাধীন বাংলাদেশ । মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে এল। আমাদের সূর্যসন্তানরা সবাই ফিরল। চারিদিকে আনন্দ অনেক। আমার পাড়ার ছেলেরা যারা যুদ্ধে গিয়েছিল- তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সবাই জানে আব্বা বন্দী ছিলেন দীর্ঘদিন। রেডিওর লোকেরা আসছেন। পত্রিকা থেকে ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য সাংবাদিকরা আসছেন। সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য লোকজন আসছেন। আব্বা সবাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন 'আমার কিছু বলার নাই।' আমি একদিন আব্বাকে বললাম, 'আব্বা যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল, আপনার বন্দিকালীন সময়ের কথা- আপনি আমাদেরকে কোন সময় কিছু বলছেন না। সবাই আসছে, আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছে, কিন্তু আপনি কিছুই বলতে চাচ্ছেন না।' উনি বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে থাকতেন। আমি একদিন আবার একথা বলার জন্য গিয়েছিলাম। উনি হঠাৎ করে রাগ করলেন আমার উপর। উনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো, আমার বাপু আমাকে জীবনে একটা চড় মারেন নি। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। এরা আমাকে অপমান করেছে, আর তুমি আমাকে বলছো- আমি সেই অপমানের কথা লিখি। আমি এ কথা লিখতে পারবোনা।'

এরপরে উনি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ের বন্দিজীবনের কথা আর কোনদিন বলেন নি। আমরাও আর উনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। ২০০৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারী আমাদের সবার মায়া কাটিয়ে আব্বা পরলোকে চলে যান। আব্বা মারা যাবার কয়েকদিন পরে আমার আমেরিকা প্রবাসী ছোট ভাই মনজু হঠাৎ করেই পুরনো কাগজের মাঝে একই বছরের আব্বার দুটি ডায়েরি খুঁজে পায়। যেখানে আব্বা উনার জীবনের না বলা কথাগুলি কিছুটা হলেও লিখে গেছেন। এখানে উনার জন্ম থেকে শুরু করে, পড়াশোনা, চাকরীজীবন, জীবন সংগ্রামের কথা, আমাদের ভাইবোনদের জন্ম, বড় হওয়ার কথা বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বন্দি জীবনের কথা উনি লিখেছেন। বিস্তরিত নয়। তবুও সেখান থেকে কিছুটা জানা যায়- সেই দুঃসহ বন্দী জীবনের দিনগুলির কথা। এটিকে আমরা পুস্তক আকারে প্রকাশ করি। নাম দেই 'স্মরণের আবরণে'। এই ডাইরিটা উনি দীর্ঘদিন ধরে লিখেছিলেন। জীবনের কথা, ছেলে বেলার কথা লিখে গেছেন। কিন্তু কেন যেন উনি আমাদেরকে, এমনকি আমাদের আম্মাকেও বলে গেলেন না- আমি জানিনা। যাইহোক ভাগ্যক্রমে এটি আমরা পেয়েছি। এটি আমাদের পরিবারের কাছে এক বিরাট সম্পদ। যদি কোনদিন সুযোগ হয়- এই ডাইরিতে কি লিখেছিলেন, সেগুলি আমি সবার সামনে তুলে ধরবো। আজকে শুধু একটি পরিচ্ছদ শুধু আপনাদেরকে শোনাবো, যেখানে সেই সময়ের দিনগুলির কথা লেখা রয়েছে, 'আমি তখন কাজিহাটায় আহমেদ ভিলার বাড়িতে একা থাকি। পাশের বাড়িতে লাকির আব্বা, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার নুরুল ইসলাম রাতে আমাকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পরে বাসায় ফিরছি। সেই সময় দেখি, গলির মুখে রাস্তায় মিলিটারি, খাকি পোশাকে কিছু মানুষ। হয়তোবা আমার অনুসন্ধান করতে এসেছিল। সেই ভয়ে আমি বাসায় না থেকে অন্য বাসায় থাকি। আমি পরদিন অপেক্ষা করছিলাম পোস্টিং অর্ডারের। এমন সময় অ্যাডিশনাল এসপির পিয়ন এসে আমাকে তাঁর বাংলোতে ডেকে নিয়ে যায়। ডিআইজি হাসান মাহমুদ ও এসপি আবদুল মজিদকে মেরে ফেলার পরে অ্যাডিশনাল এসপি চার্জে ছিলেন। আর্মিকে সহযোগিতা করতেন শুনেছি। বেঁচে আছেন, ঢাকায় ব্যবসা করেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ইউনিভারসিটিতে জুবেরী হাউসে আর্মি ক্যাম্পে মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে আমি বিকালে পৌঁছাই। মেজরের সঙ্গে দেখা করলে জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে আমি দিনাজপুর থেকে নবাবগঞ্জ গিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগের ডা. মেসবাহুল হকের সঙ্গে কি সম্পর্ক? আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা?' আমার সব উত্তর শুনে সন্ধ্যার পূর্বে দোতালায় একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে বন্দী করে রাখে। সেখানে দেখতে পাই, ঘরে কিছু ফোল্ডিং ব্যাগ রাখা আছে এবং মেঝেতে রক্তের দাগ। মনে হয় পূর্বে মানুষকে অত্যাচার করত। সেই সময়টি ছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ। পরের দিন হতে দুই-একজন করে বন্দি নিয়ে এসে রাখতে থাকে। তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রফেসর ডক্টর সালাউদ্দিন (পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর মুজিবুর রহমান, রাজশাহী জেলার তৎকালীন বাগমারার ওসি আবদুল্লাহ চৌধুরী (পরবর্তীতে অ্যাডিশনাল এসপি হয়ে অবসর গ্রহণ), এবং ছাত্র ও সাধারণ মানুষ ছিলেন। কাউকে রাতে নাম ধরে ডেকে বাইরে নিয়ে গেছে। তারা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ের পেছনে গুলির শব্দ শোনা যেত। এভাবে সাত দিন আমাদেরকে জোহা হলের দোতালায় রেখে ইন্টারোগেশান শেলে টর্চার করত। পরে আমাদের নাটোর সাবজেলে নিয়ে রাখে। সেখানে একটি ছোট ঘরে গাদাগাদি করে অন্তত ৫০ জনকে রাখত ও তাদের খেয়াল মত বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালাত। প্রায় এক মাস পর আমাদের কয়েকজনকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদেরকে মাত্র এক দিন রাখার পর আবার রাজশাহীর নাটোর সাবজেলে ফিরিয়ে আনে।'

কিছু কথা : আব্বার শৈশব জীবনের কিছু কথা বলি। গোমস্তাপুর থানার এক নিভৃত গ্রামে ১৯২৪ সালে এই শিশুটির (আব্বা) এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্ম হয়। সেইসময়ে মুসলমান সমাজে লেখাপড়ার কোন গুরুত্ব ছিলনা। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করে উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সময় গ্রামে স্কুল ছিল না। খুব ছোট অবস্থায় ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় উনাকে চলে আসতে হয় ভালো স্কুলে পড়ার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে। এরপরে কানসাট স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে রাজশাহী কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে চাকরিতে জয়েন করেন। আর তাঁর গ্রামে ফেরা হয়নি। সারা জীবন নীতি, আদর্শ আর সততা- এই ছিল উনার জীবনের মূলমন্ত্র। মাঝে মাঝে আমি যখন ভাবি, একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে নিজের চেষ্টায় আমাদের পরিবারের অন্যান্যদের কাছে অসাধারণ হয়ে উঠলেন? আমরা চার ভাইবোনেরা তার গুণাবলীর হয়তো কিছুই পাইনি, তবে এখনও উনার দেখানো পথে আদর্শের পথে, সততার পথে আমরা চলছি। এই হচ্ছে একজন সাধারণ মানুষের আমাদের কাছ থেকে প্রস্থানের কথা।

লেখক আশরাফ আহমেদ মুক্তা : প্রশিক্ষিত উদ্ভিদবিদ ও চা-বাগান ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ